ষষ্ঠঅধ্যায়

উনিশ শতকের গীতিকাব্যে স্বদেশ ভাবনা

বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতা একটি সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য প্রকরণ। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনার বিষয়টি স্পষ্ট করতে হলে গীতিকবিতা নামক প্রকরণটির আলোচনা অপরিহার্য। এই শতকে সচেতন বাঙালীকে জাতীয় দুরবস্থার ভাবনা বেশ আহত করেছিল। এই সময়েই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতিকবির এই মহৎ কর্ম প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে বলেন;—

"কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান ।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার ।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্যমাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি ।" (১)

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, মানুষের চেতনাকে সুপথে চালিত করতে কবির এক বড় ভূমিকা রয়েছে। কবি দরিদ্রতা, সংকীর্ণতা, দুর্বলতা সর্বোপরি সুস্থ, সমৃদ্ধ ও সচেতনভাবে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-উপদেশ দিতে পারেন। শুধু নীতি-উপদেশই নয়, জাতীয় জীবনের প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে কবির এক বড় ভূমিকা রয়েছে। আমরা লক্ষ করব উনিশ শতকের গীতিকবিকে এই বিশেষ ভাবনা বেশ প্রভাবিত করেছিল ।

উনিশ শতকেই বাংলা গীতিকাব্য নামক বিভাগটি বেশ সমৃদ্ধ হয় । ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ উনিশ শতকের স্বনামধন্য গীতিকবি। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতা রচনার প্রয়াস নতুন নয়। 'চর্যাপদ', 'বৈষ্ণবপদ', 'শাক্তপদ' এর মতো গীতিধর্মী কাব্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত হয়েছিল। যদিও আধুনিক গীতিকবিতার সঙ্গে প্রাচীন বা মধ্যযুগে রচিত গীতিকবিতার পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। আধুনিক গীতিকাব্যে কবির ব্যক্তিক

অনুভূতিই প্রধান । কিন্তু আধুনিক গীতিকবিতার পূর্বে রচিত গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিক অনুভূতির চাইতে ধর্মীয় অনুভূতির প্রাধান্য দেখা যায় । বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকবি হিসাবে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের একাধিক কবিকে নির্বাচন করেছেন । তিনি বলেছেন;—

> "বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য । অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।" (২)

আধুনিক কবি মধুসূদন দত্ত প্রমুখ কবির সঙ্গে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসকেও গীতিকবি বলা হয়েছে । তবে এখানে উনিশ শতকের পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্পর্শে যেসব কবি এসেছিলেন, সেই আধুনিক কবিদের গীতিকবিতার আলোচনা করা হয়েছে । গীতিকবিতায় প্রকাশিত স্বদেশ ভাবনার বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য অধ্যায়টিকে চারটি ভাগ করা হয়েছে ।

ক) উনিশ শতকে আধুনিক গীতিকাব্যের প্রথম পর্ব বা প্রস্তুতি পর্বে স্বদেশ ভাবনা ।

খ) জাতীয়তাবাদের যুগে গীতিকাব্যের চর্চা ও স্বদেশ ভাবনা ।

গ) গীতিকবিতার আস্বাদ ও বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা ।

ঘ) বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ গীতিকবিতা ও বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা ।

উনিশ শতকে আধুনিক গীতিকবিতার প্রথম পর্ব বা প্রস্তুতি পর্বে কবিগান ও ঈশ্বরগুপ্ত, জাতীয়তাবাদের যুগে গীতিকাব্যের চর্চায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন, গীতিকবিতার আস্বাদ পর্বে মধুসূদন দত্ত এবং বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ গীতিকবিতা নামক পর্বে বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা আলোচিত হবে । কারণ কবিগানে বা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা আধুনিক মনের উপযোগী বিশুদ্ধ গীতিকবিতা নয় । সেজন্যই এইসব গীতিকবিতাগুলি আধুনিক গীতিকবিতার প্রস্তুতি পর্ব বা প্রথম পর্ব বলা যায় । হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন একাধিক বিষয়ে কবিতা লিখলেও যেহেতু দুই কবির জাতীয়তাবাদী মনোভাবের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মিল সেই জন্য তাঁদের রচিত খণ্ড কবিতা বা গীতিকবিতাগুলি জাতীয়তাবাদের যুগে গীতিকবিতার চর্চা নামক অংশে আলোচনা করা হয়েছে। মধুসূদন দত্তের কবিতায় প্রথম ব্যক্তিক অনুভূতির শিল্পরূপ পাওয়া যায়, সেজন্য তাঁর কবিতাকে বলা হয়েছে গীতিকবিতার আস্বাদ যুক্ত কবিতা। এই শতকে মধুসূদনের পরে বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা গীতিকবিতাকে বিশুদ্ধ শিল্পরূপ প্রদান করেন, সেজন্য বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কবির রচনাকে বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ গীতিকবিতা বলা হয়েছে ।

উনিশ শতকেআধুনিক গীতিকাব্যের প্রথম পর্ব বা প্রস্তুতি পর্বে স্বদেশভাবনা ঃ

উনিশ শতকের পূর্বে বিশুদ্ধ ব্যক্তিক অনুভূতিপ্রবণ গীতিকবিতা ছিল না। মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথম বিশুদ্ধ গীতিকবিতা লেখেন। এবিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন;—"মধুসূদনের অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'আত্ম-বিলাপ' এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। নবীন বাঙ্গালা কাব্যে কবি-আত্মকথা আত্ম-বিলাপেই প্রথম শোনা গেল।" (৩) অর্থাৎ সুকুমার সেন মনে করেন, 'আত্মবিলাপ' (১৮৬২) কবিতাতেই প্রথম বিশুদ্ধ গীতিকবিতার লক্ষণ উপস্থিত। এই প্রসঙ্গটি 'আধুনিক সাহিত্যের উপক্রম' নামক আলোচনায়ও পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন;—

> "ইংরেজী শিক্ষার গুণে শহরবাসী ভদ্র বাঙ্গালীর যে মানসিক পরিবর্তন শুরু হইল তাহাতে প্রথমে জাগিল প্রতিক্রিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা, যাহা সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত রচনায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যঙ্গ-কবিতায় বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। ...অনতিবিলম্বে মাথা তুলিল সমাজ-চেতনা।...তাহার পর জাগিল ব্যক্তি-চেতনা। তাহা সর্বপ্রথম মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যে দেখা দিল। তাঁহার অগ্রগামীদের রচনার আলিখিত ভূমিকায় ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ছিল না। ...চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কোন কোনটিতে আবার ব্যক্তিচেতনার উপরে আত্মচেতনারও প্রতিবিম্বন হইয়াছে।" (৪)

অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় আধুনিকতার কিঞ্চিৎ লক্ষণ থাকলেও মধুসূদনের হাতেই বাংলা গীতিকবিতার প্রথম সূচনা। কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে, উনিশ শতকে ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বে কি কোন গীতিকবিতার সন্ধান পাওয়া যাবে না? অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ববর্তী ও সমকালে গীতিকবিতার লক্ষণ যুক্ত কিছু গানের সন্ধান পাওয়া যায়। এই গানগুলি বৃটিশ-শাসিত কলকাতার নাগরিক সাহিত্য। যার পোষাকী নাম 'কবিগান'। রচয়িতাদের বলা হয় কবিওয়ালা।

কবিওয়ালাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন;—রামবসু, এন্টনী ফিরিঙ্গী, নিধুবাবু, দাশরথী রায় প্রমুখ। এছাড়া গোঁজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, রামু ও নৃসিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার ওরফে কেষ্টা মুচি, নিতাই বৈরাগী, শ্রীধর কথক, কালী মির্জা প্রমুখ কবিওয়ালা এই বিশেষ সাহিত্য শাখায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই কবিওয়ালা রচিত কবিগানে উনিশ শতকের আত্মচেতনা নির্ভর স্বদেশ ভাবনার অনুসন্ধান করা পণ্ডশ্রম। এইসব কবিওয়ালাদের না ছিল কোন শিক্ষা, না ছিল সচেতনতা। অতএব এঁদের আদর্শ বাঙালী জীবনে প্রগতি এনে দেবে এমন আশা না করাই ভাল। অবশ্য এঁদের রুচিহীন গানের পাশে আকস্মিকভাবে ধূমকেতুর মতো নীতিবোধ যুক্ত গানের পরিচয় পাওয়া যাবে। বিশেষ করে উল্লেখ করার মতো এন্টনি ফিরিঙ্গীর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, যা আজও অনুসরণযোগ্য।

এণ্টনি ফিরিঙ্গী বলেন —

"খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিন্তু ভিন্ন নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে
আমার মানবজনম সফল হবে যদি রাঙা চরণ পাই।।" (৫)

আর এক বিখ্যাত কবিওয়ালা রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু (১১৪৮-১২৪৫ বঙ্গাব্দ)। নিধুবাবুর গান মানবীয় ঘটনা কেন্দ্রিক। তাঁর বিরুদ্ধে রুচিহীন গান রচনার অভিযোগ থাকলেও দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ধর্মী গানের সন্ধান পাওয়া যায়। ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক আগে একমাত্র নিধুবাবুই মাতৃভাষার গৌরব গান গেয়েছেন। নিধুবাবুর ভাষায়—

"নানান দেশের নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষে পুরে কি আশা।
কত নদী সরোবর, কি বা ফল চাতকীর
ধারা জল বিনে কভু ঘোচে কি তৃষা" (৬)

মাতৃভাষাকে ধারা জলের সঙ্গে তুলনা করে আধুনিক শিক্ষা বর্জিত নিধুবাবু যেন ভাষাবিজ্ঞানীর মতো এক সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্বের অবতারণা করেন, যা শ্রোতার মনে মাতৃভাষা প্রীতি জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট।

তবুও শেষে বলা যায় — উনিশ শতকের কবিগানে গীতিকবিতার লক্ষণ থাকলেও সমাজ বা দেশের এমন কি সাহিত্যের পক্ষে এমন গঠনমূলক ভূমিকা নিতে পারেনি, যার জন্য কবিগান আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উনিশ শতকে গীতিকবিতা নামক প্রকরণের সমৃদ্ধিও বাঙালীর আত্মবিকাশের অনুসন্ধানের জন্য আমাদের ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের কাব্যকবিতা শরণাপন্ন হতে হবে।

উনিশ শতকে আধুনিক গীতিকাব্যের প্রথম পর্ব বা প্রস্তুতি পর্বে আমরা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার আলোচনা করব। কেননা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে একমাত্র কবি ও স্বনামধন্য সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। আধুনিক কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৫৯) প্রকাশের পূর্বে একমাত্র ঈশ্বর গুপ্তই বাংলায় কাব্য চর্চা

করেছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ চিন্তানায়ক বাংলা গদ্য চর্চার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। সেই সময় কেবল ঈশ্বর গুপ্তই বাংলায় কাব্য চর্চায় মগ্ন। তিনি শুধু কবিতা লিখেই ক্ষান্ত থাকেন নি, —তিনি প্রাচীন কবিদের কাব্য ও জীবনী সংগ্রহ এবং আধুনিক কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখকে কাব্য চর্চায় উৎসাহ দিতেন। এবিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন বলেন—

> "ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যসাধনায় আধুনিকতার প্রকাশ তাঁহার ইতিহাস চেতনায় প্রতিবিম্বিত।...এই ইতিহাস চেতনায়ই তাঁহাকে রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির এবং লালু-নন্দলাল প্রভৃতি কবিওয়ালার জীবনী ও রচনা সংগ্রহে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রথম প্রচেষ্টাও এই প্রথম।...
>
> ঈশ্বর গুপ্তের এই ইতিহাস চেতনার মূলে ছিল তাঁহার অবিসংবাদিত দেশপ্রেম। সেই সঙ্গে ছিল মজ্জাগত কবিতাপ্রীতি। যে প্রেরণায় তিনি প্রাচীন কবিদের পুনরুজ্জীবন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তাহারই বশে তিনি নবীন কবিদের তৈয়ারি করিতে চাহিয়াছিলেন।" (৭)

প্রাচীন কাব্য ও কবিদের বিষয়ে ১৫ই জুলাই, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় 'এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির প্রতি বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন'এ ঈশ্বর গুপ্ত বলেন—

> "এতদ্দেশীয় যে সকল প্রাচীন কবি মহাশয়েরা বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রণীত পুরাতন কবিতা ও সংগীত সকল এবং সেই সেই পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া যিনি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা মহোপকার স্বীকার পূর্ব্বক যাবজ্জীবন তাঁহার স্থানে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ রহিব, এবং তাঁহাকে দেশহিতৈষিদলের প্রধান শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিব।" (৮)

ঈশ্বর গুপ্তের এই স্বীকৃতি থেকে বোঝা যায় প্রাচীন কাব্য ও কবির রচনা ও জীবনী সংগ্রহে তিনি ছিলেন অকৃত্রিম অনুরাগী।

ঈশ্বর গুপ্তের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কর্মপ্রয়াস হল 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) এর মতো সংবাদপত্র সম্পাদনা। এবিষয়ে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

> "তিনি সাধারণ অর্থে শিক্ষিত ছিলেন না, ইংরেজী কিছুই জানতেন না, অথচ কোন কোন ব্যাপারে, বিশেষতঃ পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে বিস্ময়কর প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত জনপ্রিয়তার জন্য 'সংবাদ প্রভাকর' দ্বি-সাপ্তাহিক, মাসিক ও দৈনিক আকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদ, রাজনৈতিক মন্তব্য, ইংরেজ শাসনে সমালোচনায় ও আধুনিক শিক্ষা প্রচারে ঈশ্বর গুপ্ত যথেষ্ট মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশ, সমাজ, সাহিত্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা তাঁর পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। তাই তাঁকে বাংলা বার্তাজীবীদের গুরু বলা হয়।" (৯)

এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন শাসন ব্যবস্থা, কলকাতায় নতুন নাগরিকের অভিনব জীবনাচরণ, মানুষের মনে পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ, ইয়ংবেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রাচীনপন্থীর সংকীর্ণ মনোভাব, উদার ও মানবতাবাদী রাজা রামমোহন রায় প্রমুখের নানা সংস্কারমুখী কার্যকলাপ সচেতন ও নাগরিক মনকে প্রভাবিত করেছিল। ঈশ্বর গুপ্ত এমন একটি ভাঙ্গাগড়ার সময়ে আবির্ভূত হয়ে স্বজাতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এখানে আলোচনা করা হবে সমকালের উত্তাল ভাব-তরঙ্গের পটভূমিতে ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিতাগুলি কোনরকম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল কি না।

ঈশ্বর গুপ্ত যুদ্ধ বিষয়ক, অধ্যাত্মবিষয়ক, সংস্কৃতি বিষয়ক, নীতি বিষয়ক, প্রকৃতি বিষয়ক, প্রেম বিষয়ক, স্বদেশ বিষয়ক প্রভৃতি নানামুখী কবিতা লিখেছেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতাগুলি যেন লোকশিক্ষার জন্য রচিত। ধরা যাক 'শীক সংগ্রাম', 'কাবুলের যুদ্ধ', 'ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম'-এর মতো যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাগুলির কথা। এই কবিতাগুলি ইংরেজ শাসন-স্তুতি বিষয়ক কবিতা। আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলা রচনায় স্বদেশ ভাবনা। কিন্তু উল্লিখিত যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাগুলি স্বদেশ প্রেমভাবের বিরোধী। তাহলে কবি লিখিত যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাগুলিকে দেশবিরোধী কবিতা বলতে হয়। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেশানুরাগের প্রতিকূল বিষয় থাকলেও পরোক্ষে দেশের প্রতি ভালোবাসাই প্রকাশ পেয়েছে। উদ্ভূত বিরোধাভাসের সমস্যাটির সমাধান পাওয়া যাবে কবির সুগভীর স্বদেশ প্রেম ভাবনার মধ্যে। মধ্যযুগের বিশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে ইংরেজের শাসনভার গ্রহণের ফলে। তাঁরা মধ্যযুগের তুলনায় এদেশে অনেক বেশী সুখ ও স্বাচ্ছন্দ এনে দিতে পেরেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত নানাসাহেব, শীক, লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখ স্বদেশীয়দের বিক্ষিপ্ত বিরুদ্ধাচরণের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। সেজন্য তিনি একাধিক যুদ্ধ বিষয়ক কবিতায় স্বদেশীয়দের পরাজয় কামনা করেন। যেমন;—'কানপুরের যুদ্ধ', 'শীক সংগ্রাম', 'মুদকির যুদ্ধ', 'কাবুলের যুদ্ধ' প্রভৃতি কবিতায় ইংরেজের বিজয়ে কবি উল্লসিত হয়েছেন এবং ইংরেজ পরাজয়ে গভীরভাবে মর্মাহত হতেন। 'শীক সংগ্রাম'এর 'যুদ্ধের জয়' কবিতায় কবি ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজের জয়ে দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়েছেন। এদেশের জনসাধারণের প্রতি তিনি আবেদন জানিয়েছেন;—

"এ দেশের প্রজা সব, ঐক্য হয়ে সুখে।
রাজার মঙ্গল গীত, গান কর মুখে।।
ধন্য চিপ কমাণ্ডার, ধন্য দেও লর্ডে।
ইংরেজের ব্যাঙ্ক বাড়ে, থ্যাঙ্ক দেও গডে।।

— — —

সদর সমরকল্পে, বিভু দয়াময়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়।। (১০)

'দ্বিতীয় যুদ্ধ'-এ কবি প্রায় একই আবেদন করেন;—

"ভারতের অবোধ, দুর্বল লোক যত।
ডাল্ ভাত মাচ্ খেয়ে, নিদ্রা যাবে কত?
পেটে খেলে পিটে সয়, এইবাক্য ধর।
রাজার সাহায্য হেতু, রণসজ্জা কর।।
লাহোরের শীক সেনা, শক্ত অতিশয়।
এখন, আলস্য করা, সমুচিত নয়।।" (১১)

হয়ত এর একটি কারণ থাকতে পারে। সমকালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন বা ইংরেজ প্রশাসক পরাজিত হলে মধ্যযুগের অরাজক শাসন প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা। প্রসঙ্গত ডঃ সুকুমার সেনের সুচিন্তিত মতামতের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন —

"মিউটিনিতে বাঙ্গালী যোগ দেয় নাই, তাহার কারণ বাঙ্গালী-সিপাহী বলিতে কিছু ছিল না এবং সিপাহীদের ষড়যন্ত্রে অ-সিপাহী বাঙ্গালীর যোগ দিবার কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপলক্ষ্যও ছিল না। সত্য বটে যে শিক্ষিত বাঙ্গালী সিপাহী বিদ্রোহে উল্লসিত হয় নাই, শঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে লজ্জার কিছু নাই। সিপাহী বিদ্রোহের একটা প্রধান কারণ ছিল সমাজ-সংস্কার বিমুখতা। ইংরেজ বিধবাবিবাহ আইন পাস করিয়াছে, সে আমাদের ইংরেজী শিখাইয়া বিদেশিভাবাপন্ন করিতেছে, সে আমাদের জাতিপাঁতিতেও হাত দিতে উদ্যত—এইসব ধারণাই উত্তর পশ্চিম ভারতে সিপাহীদের, লুঠেরাদের ও গুণ্ডাদের এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের একটা বড় অংশকে এবং অধিকারচ্যুত ভূস্বামীদের উত্তেজিত করিয়াছিল। তাহাদের পিছনে ক্ষমতাস্পৃহ মতলববাজেরা তো ছিলই। সিপাহীদের জয়লাভ মানে আবার জরাজীর্ণ মোগল আমলের দস্যুরাজত্বে প্রত্যাবর্তন এবং প্রায় শতাব্দীব্যাপী প্রগতির অত্যন্ত প্রতিষেধ। শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে এ চিন্তা অবশ্যই অসহ ছিল।" (১২)

আসলে ঈশ্বর গুপ্তের কাছে মধ্যযুগীয় শাসনের চাইতে সুশৃঙ্খল শাসন অনেক আদরণীয়। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে ইংরেজের দাস ভেবে পুলকিত হতেন বা এদেশ অনন্তকাল পরাধীন থাকুক এমন কামনা করেন নি। বরং তাঁর মনে পরাধীনতার জন্য গ্লানিবোধ ছিল। 'আচারভ্রংশ' কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত সে বেদনা

ব্যক্ত করেন এইভাবে;—

"ওহে কাল কালরূপ, করালবদন।
তোমার রদনযুক্ত, মরালবাহন।।
দেব দেবী কত তুমি, করিয়া সংহার।
ভারতের স্বাধীনতা, করিলে আহার।।"
কিছু বুঝি নাহি পাও, চারি দিক চেয়ে।
এখন ভরাবে পেট, হিন্দুধর্ম খেয়ে? (১৩)

এখানে স্বদেশের পরাধীনতার জন্য কবি গভীরভাবে ব্যথিত। অতএব যুদ্ধ বিষয়ক কবিতায় স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধাচরণ করলেও তিনি কোন প্রকারেই দেশবিরোধী নন। বরং দেশের সুদূরপ্রসারী মঙ্গলের জন্যই স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাগুলি লিখেছেন।

লক্ষ করা যাবে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা লোকশিক্ষার গুণে সমৃদ্ধ। লোকশিক্ষার মধ্য দিয়ে বাঙালীকে শিক্ষিত ও সচেতন করতে পারলে সমাজ ও দেশের মঙ্গল। সেজন্য তিনি কবিতায় কখনো রঙ্গব্যঙ্গ বা সমালোচনা করতেন, কখনো নীতি উপদেশ দিতেন, কখনো অধ্যাত্ম শিক্ষার দ্বারা বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতিকে আগলে রাখার প্রয়াস করতেন, আবার কখনো বা কবি ঈশ্বর গুপ্ত দেশীয় বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষ অনুরাগ মূলক কবিতা লিখে বাঙালীকে দেশানুরাগের প্রেরণা দিয়েছিলেন।

রঙ্গব্যঙ্গমূলক কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের রসিকতা বোধ ও সমালোচক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জাতীয় কবিতায় তিনি ব্যঙ্গ বা সমালোচনার দ্বারা বাঙালীর ভুল শুধরে দিতে চেয়েছেন। মানুষের একপেশে রক্ষণশীল বা উগ্র আধুনিক মানসিকতায় সমাজের উন্নতি হয় না। অতএব ন্যায় ও নিরপেক্ষ মতাদর্শে সমাজকে এগিয়ে না নিলে মুক্তি অসম্ভব। ঈশ্বর গুপ্ত নিরপেক্ষ একথা প্রমাণ করা অসম্ভব; কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্য অনেক অপ্রয়োজনীয় বা অবাঞ্ছিত বিষয়ের প্রতি ব্যঙ্গ বা সমালোচনা করতেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব এদেশে ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে। কিন্তু বাঙালীর এই বিদেশী সংস্কৃতি অনুকরণ যে হাস্যকর ও অসঙ্গত সে কথা পরোক্ষে 'ইংরেজী নববর্ষ' কবিতায় বলা হয়েছে। যেমন;—

"ধন্যরে বোতলবাসি, ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের, সভ্যতার বল।।" (১৪)

কিংবা,

"গোরার দঙ্গলে গিয়া, কথা কহ হেসে।
ঠেস মেরে বসো গিয়া, বিবিদের ঘেঁসে ।।" (১৫)

এরকমই বিষয় নিয়ে 'বড়দিন' কবিতাটি রচিত। এখানেও বাঙালীর 'ইংলিস ফ্যাসন'কে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কবি রসিকতা করে বলেছেন, বড়দিনের উৎসবের লোভে নিজের হিন্দুত্বকে বর্জন করতে ইচ্ছা করে। কেননা;—

"হোটেল মন্দিরে ঢুকে, দেখিয়া বাহার।
ইচ্ছা হয় হিঁদুয়ানি, রাখিব না আর।।
জেতে আর কাজ নাই; ঈশু-গুণ গাই।
খানাসহ নানা সুখে, বিবি যদি পাই।।
চারিদিকে দেখ মন, অতি বেড়ে বেড়ে।
তোতে মোতে থাকি আয়, হিঁদুয়ানি ছেড়ে।।" (১৬)

'দুর্ভিক্ষ' ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা মূলক কবিতা। পাশ্চাত্য বা ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুণে এদেশে ইয়ংবেঙ্গল নামে একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। বাংলা ভাষায় এঁদের অবজ্ঞা, দেশীয় ধর্মে এঁদের ঘৃণা, দেশীয় সংস্কৃতির বিলোপ করতে এঁরা বদ্ধ পরিকর। কবির ভাষায়;—

"স্বোণার বাঙাল, করে কাঙাল,
ইয়ং বাঙাল যত জনা ।
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে,
কাণে লাগায় ফোঁস ফোঁসনা।।
এরা, না "হিঁদু", না "মোছোলমান",
ধর্মধনের ধার ধারে না।" (১৭)

ঈশ্বর গুপ্ত খ্রীষ্টান মিশনারিদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবে মর্মপীড়িত। কবির ভাষায়;—

"যত মিশনরি এদেশেতে,
এসে করে কি কারখানা।
তারা ঈশুমন্ত্র কাণে ফুঁকে,
শিশুকে দেয় কুমন্ত্রণা!
ফেরে হাটে, ঘাটে, বাটে, মাঠে,
নানা ঠাটে, ফন্দি নানা।
বলে দিশি কৃষ্ণ ছেড়ে তোরা,
ঈশুখ্রীষ্ট কর ভজনা!" (১৮)

কবি সমকালের মেয়েদের ইংরেজী শিক্ষা ও বিধবার বিবাহকে সুনজরে দেখেন নি। ঈশ্বর গুপ্ত মনে করতেন এতে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি আক্রান্ত হবে। এসব বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের ধারণা কতখানি সমর্থনযোগ্য— সে বিতর্কে না গিয়ে বরং বলা চলে নারী বিষয়ে রক্ষণশীল মানসিকতার পিছনে তাঁর মনে দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিলোপের আশঙ্কা ছিল। সমকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এদেশের তরুণরা এলে যে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী তৈরী হয়, তাদের মাত্রাতিরিক্ত বেপোরোয়া মানসিকতা দেখে ঈশ্বর গুপ্ত চান নি মেয়েদের সমাজ থেকে ইয়ংবেঙ্গলের মত দেশীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দলনকারী একটি সমাজ তৈরী হোক। সেজন্য তিনি বলেছিলেন;—

"আগে মেয়ে গুলো, ছিল ভালো;
ব্রত ধর্ম কোর্তো সবে।
একা "বেথুন" এসে, শেষ কোরেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে ?

— — —

ও ভাই! আর কিছু দিন, বেঁচে থাকলে,
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।।" (১৯)

কিংবা বিধবার বিয়ে প্রসঙ্গে বলেন;—

"ঘোর পাপে ভরা, হোলো ধরা,
রাঁড়ের বিয়ের হুকুম যবে।" (২০)

ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা মূলক আর একটি কবিতা হল 'নীলকর' (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, গীত)। উনিশ শতকে নীলকরদের অত্যাচারে কৃষকের দুরবস্থার অন্ত ছিল না। নীলকরের অত্যাচার বৃটিশ শাসনের একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। নীল একটি অর্থকরি ফসল। এদেশে নীল চাষ ছিল না। এই উনিশ শতকের প্রথম থেকে এদেশে নীল চাষ শুরু হয়। ক্রমে নীলকর সাহেব নানারকম কৌশল অবলম্বন করে শোষণের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। নীলকর সাহেবের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে এদেশের চাষীরা বিদ্রোহী হয়, যা নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯) নামে পরিচিত। সে সময়ের নীলকর সাহেবের মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক গর্জে উঠেছিলেন। কবি ঈশ্বরগুপ্ত কবিতার দ্বারা দেশীয় প্রজাসাধারণের দুর্বিষহ যন্ত্রণার দিক

ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত 'নীলকর' কবিতায় মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে বলেন;—

"মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখো আর নাহি পর্শে,
প্রজারা নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে"। (২১)

শাসন ব্যবস্থা যে ত্রুটিপূর্ণ, কবি তার উল্লেখ করে বলেন;—

"এ দেশের দুর্দশা এমন্,
হয়নিকো আর হবেনাকো।।
কুটিয়ালের মেজেষ্টরি,
লাঠিয়ালের রেজেষ্টরি,
এ আইন হয়েছে জারি
মার্তে আমাদের।" (২২)

অসাধু ব্যবসায়ী ও নীলকর সাহেবের শোষণ প্রজাসাধারণের আর্থিক ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। কবির ভাষায়;—

"চার্ টাকা মণ দর্ উঠেছে, নূতন চেলে।
আর কত চল্বো নূতন চেলে ? (২৩)

কবি এরকম অপশাসন নিবারণের জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে অনুরোধ জানান। কবি বলেন;—

"ভারতের ভার দিবে যারে,
এই কথাটী বোলো তারে, মা গো!
যেন ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে,
কার্য করে কুতূহলে।" (২৪)

ঈশ্বর গুপ্ত সমাজের মানুষকে সচেতন করতে অনেক নীতিমূলক কবিতা লিখেছেন। যেমন, পৃথিবীতে বিষয়-আশয়, অহংকার, সুন্দরী নারী প্রভৃতির প্রতি আসক্তি অনেক সময় জীবনে অধঃপতন ডেকে আনে। কবি তাই 'সব হ্যায় ফাক্' কবিতায় বলেন;—

"দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্, বাবা সব হ্যায় ফাক্।
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক, বাবা মিছা কর জাঁক।।" (২৫)

এ যেন ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক শঙ্করাচার্যের 'মায়াবাদ'-এর বাংলা কবিতা রূপ। অবশ্য তাই বলে মানুষ একে বারে নিরুৎসাহী হলে জগৎ সংসার অচল হবে। সেজন্য কবি বলেন—এই পৃথিবীর অনেক বিষয়ের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে ভোগ করলে সুখ ও শান্তি পাওয়া যায়। সেজন্য 'সব ভরপূর' কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত নেতিবাচক ভাবনার পরিবর্তে তাঁর রসিক মনের পরিচয় দেন। যেমন;—

"দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর, বাবা সব ভরপূর।
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর, বাবা গৌরব প্রচুর।।
পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগ-পথে মন দেহ,
পরিহরি মোহ স্নেহ চল সুরপুর।" (২৬)

এখানে দান, দয়া প্রভৃতি নীতিধর্মের কথা বলা হয়েছে। এরকম আর একটি নীতি মূলক কবিতা 'কিছু কিছু নয়'। এই কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত মানুষকে শুধু আসক্ত হয়ে থাকতে যেমন বারণ করেছেন তেমনি প্রয়োজনে নিরাসক্ত হতেও বারণ করেন। সেজন্য তিনি উপদেশ দিয়ে বলেন;—

"ধন বল জন বল, সহায় সম্পদ বল,
পদ্মদলগত জল, চিহ্ন নাহি রয়।
— — —
তব-ভ্রম পরিহরি, মুখে বল হরি হরি,
কৃতান্তকুঞ্জর হরি, হরি দয়াময়।।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়।।" (২৭)

'সাম্য' একটি উৎকৃষ্ট নীতি-উপদেশ মূলক কবিতা। এতে পৃথিবীর সব জীবকে সমান ভাবার জন্য আবেদন আছে। কেননা 'সর্বভূতে' ঈশ্বর থাকেন। নীতিকথার একটি পংক্তি এরকম;—

"সকলেরে জ্ঞান কর, আপনার সম।
তাহাতেই সিদ্ধ হবে, দম আর শম।।" (২৮)

'শরীর অনিত্য' ঈশ্বর গুপ্তের লেখা নীতিমূলক কবিতার আরো একটি দৃষ্টান্ত। কবি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেন;— "জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়।।" (২৯)

জীবনকে পরিপূর্ণতা এনে দিতে পারে; —

"দ্বেষ হিংসা পরিহর, বিবেকের সঙ্গ ধর
সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয়।" (৩০)

ধর্ম বিশ্বাসী ভারতবাসী তথা বাঙালীর নিকট বড় সম্পদ ঈশ্বরের কৃপা লাভ। এদেশের মানুষ জীবনে পরম শান্তি লাভের জন্য ঈশ্বরের সেবা করে দিন কাটিয়ে দিতে চান। কবি ঈশ্বর গুপ্ত স্বধর্মে আস্থা রেখে আনন্দময় পুরুষ ঈশ্বরের বন্দনামূলক বা তাঁর তত্ত্বরূপকে বিষয় করে কিছু কবিতা লিখেছেন। যেমন—'নির্গুণ ঈশ্বর', 'বিষয়ে সুখ নাই', 'তত্ত্ব', 'পরমার্থ', 'শ্রীমদ্ভাগবত' ইত্যাদি। এই সব কবিতায় তিনি ঈশ্বরের গুণাবলী ও নানা তত্ত্বকথার প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের অনেক আস্থাহীন মানুষের নিকট এই কবিতাগুলি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রকাশ্যে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির বন্দনা করেছেন। তিনি 'স্বদেশ' কবিতায় জন্মভূমিকে পবিত্র শিবধাম বলে উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়;—

"ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার।।" (৩১)

স্বদেশবাসী প্রসঙ্গে তাঁর সুগভীর অনুরাগ এরকম;—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।।" (৩২)

মাতৃভাষা ঈশ্বর গুপ্তের নিকট অমৃত তুল্য। মাতৃভাষা প্রসঙ্গে কবির ভাবনা আধুনিক শিক্ষাবিদের মতো। কবির ভাষায়;—

"যে ভাষায় হোয়ে প্রীতি, পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃ সম মাতৃভাষা, পূরালে তোমার আশা,
তুমি তায় সেবা কর সুখে।।" (৩৩)

'স্বদেশ' ও 'মাতৃভাষা' বিষয়ে কবির সুগভীর অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে।

উনিশ শতকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-মধুসূদন দত্ত-হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-নবীনচন্দ্র সেন-বিহারীলাল চক্রবর্তী-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ আধুনিক কবির আবির্ভাবের পূর্বে একমাত্র ঈশ্বর গুপ্তই বাংলা কাব্যচর্চা করতে গিয়ে স্বদেশ, মাতৃভাষা, দেশীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা কবিতায় অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন। এই বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ঈশ্বর গুপ্ত আমাদের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র।

জাতীয়তাবাদের যুগে গীতিকাব্যের চর্চা ও স্বদেশ ভাবনা ঃ

বাংলা সাহিত্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের অধিকাংশ কাব্যের আবেদন প্রায় সমধর্মী। উভয়েই বাংলা সাহিত্যে আখ্যানকাব্যের কবি হিসেবেই বিখ্যাত। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার কাব্য' (১ম খণ্ড, ১৮৭৫, ২য় খণ্ড, ১৮৭৭) ও নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক' (১৮৮৬) 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) 'প্রভাস' (১৮৯৬) নামে 'ত্রয়ীকাব্য' বাংলা আখ্যানকাব্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। এই দুই কবি আখ্যানকাব্যের কবি হিসাবে পরিচিত হলেও গীতিকাব্যের লক্ষণ যুক্ত কিছু কিছু খণ্ড কবিতা লিখেছিলেন।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের আর একটি ক্ষেত্রে যথেষ্ট মিল রয়েছে। দুই কবিই সমকালের যুগরুচির দ্বারা প্রভাবিত। ইতিমধ্যে সিপাহিবিদ্রোহ (১৮৫৭) ও নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯) সংঘঠিত হয়। ইংরেজ শাসনের প্রতি সর্বস্তরের মানুষ ক্রমশ আস্থা হারাতে থাকে । সবচাইতে বড় কথা হল শাসকের বিমাতৃসুলভ ভাব শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তিকে আহত করেছিল। বিষয়টি আমরা পূর্বের 'উনিশ শতকের নাট্যসাহিত্যে (নাটক ও প্রহসন) স্বদেশ ভাবনা' ও 'উনিশ শতকের মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যে স্বদেশ ভাবনা' অধ্যায়ে জাতীয়তাবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। একদা রামমোহন-প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ বাঙালীর নিকট বিদেশী শাসন ছিল স্বপ্নের মতো। এই পর্বে সেই স্বপ্নের পরিবর্তন হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭), 'ভারত সভা' (১৮৭৬) প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী সভা সমিতি গঠিত হয়। এই সময় হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কবিতা লেখেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যের আবেদন বিষয়ে বলেন;—

> "বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনায়, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির উদ্দীপনাময় কবিতায় একদিকে যেমন দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি তাহা হিন্দুদের মনে পৃথক জাতীয়তা ভাবের ইন্ধন যোগাইতেছিল।" (৩৪)

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সেন যখন কবিতা চর্চা শুরু করলেন তখন শিক্ষিত বাঙালীর মনে ক্রমশ জাতীয়তাবোধ জেগে উঠছিল। নিজ দেশের পরাধীনতা আত্মসচেতন বাঙালীকে আহত করত। কিন্তু উপায় ছিলনা, দেশ তখনও স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হয়ে উঠেনি। কিন্তু সেজন্য দেশহিতৈষী চিন্তানায়কগণ আত্ম বিশ্বাসের মতো জনসচেতনতা সৃষ্টি করার মহৎ কাজ থেকে পিছিয়ে থাকে নি। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন স্বদেশের

মঙ্গলের জন্য কবিতার দ্বারা জনচেতনা বৃদ্ধির কাজ করেছিলেন। আমরা লক্ষ করব তাঁদের গীতিকবিতায় কখনো কখনো স্বদেশের দুরবস্থার জন্য বিলাপ, কখনো ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি গৌরব কথা, আবার কখনো দুরবস্থা মোচনের জন্য আত্মবিশ্বাস জাগানোর মহৎ প্রেরণার কথা শোনা যায়।

প্রথমে কবি হেমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৯০৩) খণ্ড কবিতা বা গীতিকবিতার আলোচনা করা হবে। হেমচন্দ্রের-সাহিত্য জীবনের সূচনা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে মোটামুটি সত্তরের দশক থেকে। এই সময়ে যুগভাবনা তাঁর গীতিকবিতা 'কবিতাবলী' (প্রথম খণ্ড ১৮৭০ ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০) ও 'চিত্তবিকাশ'-এ (১৮৯৮) যথেষ্ট সক্রিয়। অবশ্য গ্রন্থাকারে স্থান পায়নি এমন অনেক কবিতাতেও সমকালীন যুগভাবনা রয়েছে। হেমচন্দ্র প্রকৃতি, প্রেম, স্বদেশ প্রভৃতি বিষয়ে একাধিক কবিতা লিখেছেন। তবে স্বদেশ বিষয়ক কবিতাগুলিতে ব্যক্তি হেমচন্দ্রের অনুভূতি অত্যন্ত প্রখর। এই জাতীয় কবিতা পাঠ করলেই বোঝা যাবে কবি কৃত্রিম ভাবরাজ্য থেকে কবিতার ভাববস্তু সংগ্রহ করেন নি। বলা যায়, এরকম কবিতা কবি হেমচন্দ্রের একান্ত নিজস্ব সামগ্রী। এতে দেশ, জাতি ও জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কবির অকৃত্রিম দরদ প্রকাশ পেয়েছে। সমকালের দুরবস্থা বর্ণন, অনেকক্ষেত্রে তা থেকে মুক্তির উপায়, জাতীয় গৌরবে গৌরব বোধ সর্বোপরি জাতিকে উৎসাহ প্রদানের মতো বিষয় দেশের প্রতি কবি হেমচন্দ্রের দায়বদ্ধতার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবিতাবলী' প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড, 'চিত্তবিকাশ'-এর বিভিন্ন কবিতা এবং 'কবিতাবলী' ও 'চিত্তবিকাস'-এর গ্রন্থভুক্ত নয় এমন কয়েকটি কবিতা থেকে দেশের প্রতি কবির দায়বদ্ধতার বিষয়ে আলোচনা করা হবে। ঐতিহ্যের স্মৃতিতেপূর্ণ ভারতবর্ষ উনিশ শতকে পুনরায় গৌরব অর্জনে প্রয়াসী হয়। 'কালচক্র' কবিতায় ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া, ইতালি ও ইংল্যাণ্ডের চরম উন্নতির প্রসঙ্গ রয়েছে। সঙ্গে ভারতের চরম অবনতির কথাও প্রকাশ পেয়েছে। কবির ভাষায়;—

"অই দেখ অগ্রে তার
পরিয়া মহিমা-হার
চলেছে ফরাসী জাতি ধরা স্তব্ধ করিয়া।

— — —

আমেরিকা-বাসীগণ,
নদ, গিরি, প্রস্রবণ,
জলনিধি, উপকূল লৌহজালে বাঁধিয়া।
অই শোন্ ঘোর নাদে

পূরাতে মনের সাধে
পুরুষিয়া মল্লবেশে উঠিতেছে গর্জ্জিয়া
বিনতা-নন্দন-সম
ধ'রে নিজ পরাক্রম
দেখ্ রে আসিছে রুষ্ বসুমতী গ্রাসিয়া।

ইতালি উতলা হ'য়ে
স্বকিরীট শিরে ল'য়ে
আবার জাগিছে দেখ্ হুহুঙ্কার ছাড়িয়া
বিস্তারিয়া তেজোরাশি
দেখ্ রে বৃটনবাসী
আচ্ছন্ন করেছে ধরা,
মরু দ্বীপ সসাগরা,
যত দূর প্রভাকর-কর আছে ব্যাপিয়া।"[৩৫]

এই কবিতায় সমকালীন ভারতবাসীর চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কবি হেমচন্দ্র স্বদেশের কথা ভেবে অত্যন্ত ব্যথিত। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যখন উন্নতির চরম শিখরে বিরাজ করছে—তখন ভারতবাসী নিস্তেজ। কবি অভিযোগের সুরে বলেন;—

"তবুও বারেক কি রে দেখিবি না চাহিয়া—
হতভাগ্য হিন্দুজাতি!—
— — —
সে আশা হইল দূর,
নীরব ভারতপুর,
একজন (ও) কাঁদে না রে পূর্ব্বকথা ভাবিয়া।" [৩৬]

সুদূর মধ্যযুগ থেকে সমসাময়িক কালেও ভারতবাসী পরাধীন। কবি এজন্য ব্যথিত। 'ভারত-বিলাপ' কবিতায় হেমচন্দ্র পাঠান, মোগল ও ইংরেজদের নিকট দেশের পরাধীনতার জন্য বিলাপ করেছেন। কবির

ভাষায়;—

"কি হবে বিলাপ করিলে এখন,
স্বাধীনতা-ধন গিয়াছে যখন,
মনের মাহাত্ম্য হয়েছে নিধন
তখনি সে সাধ ঘুচে গিয়াছে।
সাজে না এখন অভিলাষ করা,
আমাদের কাজ শুধু পায়ে ধরা,
মস্তকে করিয়া দাসত্বের ভরা
ছুটিতে হইবে ওদেরি পাছে!
হায় বসুন্ধরা তোমার কপালে
এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে
বিদেশীর পদে জীবন গোঁয়ালে,
পূরাতে নারিলে মনের আশা।

— — —

হায় রে বিধাতা, কেন দিয়াছিলি
হেন অলঙ্কার ? কেন না গঠিলি
মরুভূমি ক'রে,—অরণ্যে রাখিলি,
এ হেন যাতনা হতো না তায়।
তা হ'লে এখানে করিত না গতি
পাঠান, মোগল, পারস্য দুর্ম্মতি,
হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি,
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায়!"(৩৭)

জাতির পরাধীনতায় মর্মাহত কবি 'ভারতসঙ্গীত' কবিতায় স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীকে উৎসাহ দিয়েছেন। যেমন;—

"আরব্য, মিসর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"(৩৮)

কবি হেমচন্দ্র বলেন—একদা বীর প্রসবিনী ভারতমায়ের সমকালের দুরবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় আছে। কবির ভাষায়;—

"একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।" (৩৯)

এখানে যেন জাতীয় মুক্তির সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছে। সে মুক্তি প্রত্যেক ভারতবাসীর একতার মধ্যেই নিহীত।

'মন্ত্রসাধন' কবিতায় কবি ইংরেজ জাতির শৌর্য বীর্যের কীর্তন গেয়েছেন। কবি বলেন স্বাজাত্যবোধ, সাহস, মনোবল, একতা, গণআন্দোলন প্রভৃতি ইংরেজ জাতির মন্ত্রশক্তি। ভারতবর্ষের দুরবস্থা নিরসনের জন্য এই মন্ত্রশক্তির প্রয়োজন। আশাবাদী কবি উৎসাহ দিয়ে বলেন;—

"না হৈও নিরাশ—ভারত-সন্তান,"(৪০)

দেশের মানুষের সুখবরে কিংবা জাতির গৌরবে কবি আনন্দিত হতেন। তাঁর 'জয়মঙ্গল গীত' ও 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে' কবিতা দুটিতে হেমচন্দ্র অকৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করেছেন। 'জয়মঙ্গল গীত' কবিতায় স্বদেশ হিতৈষী রমেশচন্দ্র দত্তের হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি হওয়ার গৌরবময় বিষয় নিয়ে রচিত। কবি স্বদেশববাসীর এরকম সম্মানীয় পদ লাভে আনন্দ প্রকাশ করেছেন এইভাবে;—

"বংশী বাজিছে রমেশের জয়
আজ রে হৃদয়ে বড় সুখোদয়—
— — —
উজল আজি হে বাঙালির নাম
উজল ভারতভূমি।
বঙ্গের প্রধান বিচার আসনে
আজি হে প্রধান তুমি।।"(৪১)

দেশের নারীর অধিকার হীনতা কবিকে আহত করত। 'বিধবা রমণী' কবিতায় এদেশের বিধবাদের যন্ত্রণাময় বারোমাস্যার কথা সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। 'ভারত-কামিনী' কবিতাতেও নারী নির্যাতনের

চিত্র ফুটে উঠেছে যেমন;—

"অরে কুলঙ্গার হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া, সদাচার?
হয়ে আর্য্যবংশ - অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে!
এখনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হয়ে ?" (৪২)

'ভারতকামিনী' কবিতায় হিন্দুসমাজে কুসংস্কারের প্রভাবে ভারতীয় নারীদের নির্যাতন, অত্যাচার ও লাঞ্ছনার একশেষ ব্যক্ত হয়েছে। কবি স্বপ্ন দেখেন-পাশ্চাত্যের নারীর মতো এদেশের নারীও সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান জেনে জীবনকে উন্নত করবে। নারীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন না হলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। সেজন্য কবি প্রাচীন ভারতের সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, লীলাবতী প্রমুখ নারীর উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়;—

"আর কি ভারতে ওরূপে আবার
হবে রে অঙ্গনা-মহিমা প্রচার?—
পেয়ে নিজ মান, পরে নিজ বেশ
জ্ঞান, দম্ভ, তেজে পূরে নিজ দেশ,—
বীর - বংশাবলী - প্রসূতি হবে ?" (৪৩)

সম্ভবত সেই কারণেই চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু নামক দুই রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করলে কবি আনন্দে "বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে" কবিতাটি রচনা করেন। কবি লিখেছেন;—

"এত দিনে জাগিল রে জীবনে বিশ্বাস,
ঘুচিল হৃদয় হ'তে কালের হতাশ।।
বাঙালির কামিনীর হৃদয়-কমলে
পাশ্চাত্য সাহিত্য-রূপ দিনমণি জ্বলে।।" (৪৪)

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্নের ভারতবর্ষ গঠনের জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর সম্মিলিত প্রয়াসের কথা বলেন। জাগরণের বার্তা ধ্বনিত করেছেন। কবি বলেন—ভারত গঠনে মুসলমানদেরও

ইতিবাচক ভূমিকা প্রয়োজন। 'রীপন উৎসব-ভারতের নিদ্রাভঙ্গ' নামক কবিতায় হেমচন্দ্র অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ করেন। তাঁর ভাষায়;—

"একা বঙ্গ নয় হিমালয় হ'তে
কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ,
আজি এক প্রাণ হিন্দু-মুসলমান;—
জাগাতে তোমায় জেগেছে দেশ।" (৪৫)

কবি তাই আসন্ন সুদিনের প্রসঙ্গে দেশমাতাকে প্রশ্ন করেন;—

"ভাঙিল কি তবে— এতদিন পরে—
ভাঙিল কি ঘুম ভারত মাতা ?"(৪৬)

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কবি হেমচন্দ্র হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উন্নতির লক্ষে এরকম কবিতা লেখেন। 'রাখিবন্ধন' কবিতায় দেশের জাগ্রত মূর্তি কবিকে আনন্দিত করেছে। কবি বলেন;—

"কি আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে—
ভারতজননী জাগিল!"(৪৭)

অভেদ ভারত চেতনা লক্ষ করে কবি আত্মহারা। কবি হেমচন্দ্র লিখেছেন;—

"জীবন সার্থক আজিরে আমার
এ রাখি বন্ধন ভারত মাঝার
দেখিনু নয়নে— দেখিনু রে আজ" (৪৮)

বঙ্গমায়ের সন্তান কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশ প্রেমের আবেগে রঞ্জিত 'জন্মভূমি' নামক কবিতাটি উল্লেখ করার মত। কবি বলেন—গুরুত্ব ও গৌরবে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এই বঙ্গভূমি। তাঁর মতে;—

"এই ত আমার, জগতের সার,
স্মৃতি সুখকর জনম-ঠাঁই।
— — —
জগতে জননী জনম-ভুবন,
গুরুত্ব-গৌরবে দুই অতুলন,
স্বরগ (ও) নিকৃষ্ট দুয়ের (ই) কাছে।" (৪৯)

কবি সেজন্যই পরম আরাধ্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন—বাঙালী পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যতই সম্মান ও সুখ পাক না কেন, স্বদেশের প্রতি তাঁদের অনুরাগ যেন হারিয়ে না যায়। কবির ভাষায়;—

" হে জগৎপতি, এ-দাস-মিনতি,
রেখো এই দয়া বঙ্গ মাতা প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখন (ও) কেহ,
যেখানেই থাক্ যেখানেই যাক,
যতই সম্মান যেখানেই পাক,
না ভুলে স্বদেশ ভকতি স্নেহ।" (৫০)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাবে বাঙালী যখন দেশ বিদেশের পটভূমিতে স্থান লাভ করতে চলেছে, ঠিক তখন হেমচন্দ্রের এ জাতীয় বক্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যা কবির অকৃত্রিম দেশানুরাগের কথাকেই মনে করিয়ে দেয়।

বলা যায় উনিশ শতকের জাতীয় উদ্দীপনার আঁচ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতিকবিতায় ফুটে উঠেছে। কবির দেশ ও জাতির গৌরবে গৌরব বোধ এবং দুর্দিনে বেদনা বোধ, জাতীয় দুরবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কবির সদাসতর্ক দৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়গুলি থেকে প্রমাণিত হয় কবি হেমচন্দ্র একজন খাঁটি দেশানুরাগী কবি।

এবার নবীনচন্দ্র সেনের গীতিকবিতা বা খণ্ডকবিতার আলোচনা করে তাঁর দেশানুরাগের পরিচয় নেওয়া হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নবীনচন্দ্র সেন আখ্যান কাব্যের কবি হিসাবেই সর্বাধিক পরিচিত। তবুও অনেক সময় প্রকৃতি স্বদেশ প্রভৃতি বিষয় কবি-মনে যে ভাবের জন্ম দিত, তাতে কবির লেখনী নীরব থাকে নি। 'অবকাশ রঞ্জিনী' (প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৭১ ও ১৮৭৮) নামে কাব্যগ্রন্থটি প্রকৃতি চেতনা, প্রেম চেতনা, স্বদেশ ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ে রচিত গীতিকবিতা বা খণ্ডকবিতার সংকলন গ্রন্থ। নবীনচন্দ্র সেন কলেজ জীবন থেকেই স্বদেশ ভাবনা বিষয়ক কবিতা রচনা করেন। 'আমার জীবন' এর প্রথম খণ্ডে 'অবকাশ রঞ্জিনী' নামক অংশে নবীনচন্দ্র সেন বলেন;—"স্বদেশ-প্রেম কলেজে অধ্যয়ন সময়ে আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়, ...আমি পদ্যে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রথম স্বদেশের দুরবস্থায় অশ্রুবর্ষণ করি" (৫১)

'অবকাশরঞ্জিনী' '১ম ও ২য় ভাগে কবির স্বদেশ বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল;— 'চট্টোগ্রামের সৌভাগ্য', 'সায়ংচিন্তা', 'শশাঙ্ক দূত', 'মুমূর্ষুশয্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক', 'অবলা বান্ধব', 'মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অফ্ এডিন্‌বরার প্রতি', 'আর্য্যদর্শন', 'বাঙালীর বিষপান', 'অনন্ত দুঃখ', 'চিহ্নিত সুহৃদ',

'অনন্ত শয্যা', 'শবসাধন', 'ভারত উচ্ছ্বাস', 'রাজা কালীনারায়ণ রায়বাহাদুর', 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'আবাহন' প্রভৃতি। উক্ত কবিতাগুলিতে নবীনচন্দ্র সেনের স্বদেশ ভাবনা বিষয়ক যে মানসিকতা প্রকাশিত হয় তা এইরকম,— কোনো কোনো কবিতায় স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে, কোনো কোনো কবিতায় পরাধীনতার গ্লানির প্রকাশ ঘটেছে, কোনো কোনো কবিতায় স্বদেশের করুণ দুরবস্থা প্রকাশিত হয়েছে, আবার কোনো কোনো কবিতায় পরাধীনতার কারণে শিক্ষিত মনের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও স্বদেশের নারী জাতির প্রতি দরদ এবং স্বদেশের আশু রেনেসাঁসের কথাও 'অবকাশ রঞ্জিনী' কাব্যগ্রন্থের কোনো কোনো কবিতায় ফুটে উঠেছে।

'অবকাশ রঞ্জিনী' কাব্যগ্রন্থের ১ম ভাগ ও ২য় ভাগের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতার দ্বারা কবিমনের স্বদেশ ভাবনাকে প্রকাশ করা হচ্ছে।

'চট্টোগ্রামের সৌভাগ্য' কবিতায় কবি স্বদেশ চেতনার আলোক-রশ্মি দেখতে পেয়েছেন। কবির ভাষায়;—

"উঠ উঠ জন্মভূমি উঠ এক বার !
বসি অবনত মুখে, মজিয়া মনের দুখে,
বিরস বদনে মাতা কেঁদো না ক আর।
কি দুঃখে কাঁদিছ এত বল না আমায়,—
তব মুখ দেখি, বুক বিদরিয়া যায়।" (৫২)

মাতৃভূমির অবনত ও মলিন মুখ কবিকে আহত করে। জন্মভূমি মাকে কবি দুঃখ করতে বারণ করেন। কেননা, আধুনিক শিক্ষার আলো স্বদেশকে ক্রমশ আলোকিত করছে। কবি বলেন;—

"বিগলিত অশ্রুধারা কর সম্বরণ;
মাথা তোল জন্মভূমি, বল মা! আমায় তুমি,
এমন মলিন বেশ কিসের কারণ?" (৫৩)

আর সেই সঙ্গে দেশে কুসংস্কার, অচেতনতা দূর হবার পথে। কবিতার ভাষায় বলা যায়;—

"জননি! সমস্ত বঙ্গে, তব যশঃধ্বনি
হইতেছে প্রতিমুখে, তুমি কেন মনোদুখে,
কাঁদিতেছ একাকিনী দিবসরজনী।
জনরবে শত মুখে তব গুণ কয়,
বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষে মা! তোমার জয়।" (৫৪)

উক্ত পংক্তিতে কবি নবীনচন্দ্র সেন আসন্ন রেনেসাঁস বা নবজাগরণের কথা অত্যন্ত দরদের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।

'সায়ংচিন্তা' কবিতায় শিক্ষিত মনের বেদনা ধ্বনিত হয়েছে। শিক্ষার আলোকরশ্মির জন্য কবি ভারতের প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস জেনে কষ্ট পাচ্ছেন। কেননা, সমকালে ভারতের দশা অত্যন্ত করুণ। কিন্তু একদিন ভারতের ইতিহাস ছিল ঐতিহ্যশালী। কবি বলেছেন;—

"ভারতের ইতিহাস, শোকের সাগর,
কেন পড়িলাম; আমি কেন পাইলাম
আপনার পরিচয়; আর্য্যবংশ-কীর্ত্তিচয়
কেন দেখিলাম, আহা! কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর?" (৫৫)

তাই কবি বলেন — শিশুকালই সবচাইতে ভাল ছিল। কবির ভাষায়;—

"শিশুমতি এ সকল নাহি কিছু জ্ঞান,
নাহি ভাবে কিসে হবে দেশের মঙ্গল," (৫৬)

দেশের করুণ দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে একজন শিক্ষিত ও সচেতন মানুষের যে মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে, তারই কাব্যরূপ হল 'সায়ংচিন্তা' নামক কবিতাটি।

'মুমূর্ষু শয্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক' কবিতায় নবীনচন্দ্র সেন ব্যঙ্গ করে বলেন বাঙালীর মৃত্যুই ভাল। আত্মসচেতন কবি নবীনচন্দ্র সেন বলেন—যে ইংরেজ জাতি কিছু দিন পূর্বেও বর্বর ছিল, তারাই প্রাচীন সভ্য ভারতের ভাগ্য নিয়ন্তা। কবির ভাষায়;—

" সে দিনের ইংলণ্ড, কি ছার বড়াই!" (৫৭)

—এখন শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজের চোখের বালি। রাজপদে বাঙালীর অধিকার নেই। বাঙালীকে এখনও শুধুই কেরানির চাকুরি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সেজন্যই কবি মনে করেন;—

রাজপদে আমাদের নাহি অধিকার,
রাজচিন্তা আমাদের উন্মাদস্বপন,
রাজ্ঞী-প্রতিনিধি সভা অদৃষ্ট আগার,
আমাদের পক্ষে যেন নন্দন-কানন।

কেবল কেরানিগিরি বাঙ্গালী-জীবন,
বর্ণ বিনে, বিদ্যা বুদ্ধি সকলি বিফল,
অধীনতা হায়! এই দুঃখের কারণ,
সাধে বলি বাঙ্গালীর মরণ মঙ্গল!"(৫৮)

—কিন্তু কবির মনে হয়েছে দীর্ঘদিন পরাধীন এই জাতি সময় ও সুযোগ পেলেই স্বমূর্তি ধারণ করবে। কবিতার ভাষায়;— "... তেমনি সবল,
ধরিবে সতেজ মূর্ত্তি পাইলে সময়।"(৫৯)

—কবিতাটিতে অসহ্য পরাধীনতার যন্ত্রণা-কথার শিল্পসম্মত কাব্যরূপ পাঠককে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে। যাকে স্বদেশ ভাবনা বললে অত্যুক্তি হয় না।

'মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অফ্ এডিন্‌বরার প্রতি' কবিতায় যুবরাজকে উদ্দেশ্য করে জন্মভুমির করুণ দুর্দশার কথা বলা হয়েছে। এক সময় এদেশ যবন দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিল। আর এখন এদেশ কিছু স্বার্থপর ইংরেজের শাসন ও শোষণে নিঃস্ব। যুবরাজকে উদ্দেশ্য করে দেশমাতা যেন অভিযোগের সুরে বলে;—

"এখন আসিয়া কত সামান্য ইংরাজ,
বড় বড় রাজপদে হয় প্রতিষ্ঠিত,
আপনার স্বার্থসিদ্ধি একমাত্র কাজ,
আমার সন্তানে করে চরণে দলিত

— — —

সুশিক্ষিত সহৃদয় যতেক বাঙ্গালী,
ইহাদের চক্ষুশূল নয়নের বালি।" (৬০)

'অবলা বান্ধব' পত্রিকার প্রকাশ উপলক্ষে এদেশের নারী জাতির প্রতি কবি মনের সুগভীর দরদ প্রকাশ পেয়েছে। অবলা নারীদের সুখদুঃখ অবলাদের ভাষাতেই প্রকাশ হওয়া উচিত। পত্রিকার এই বিশেষ উদ্দেশ্যটি কবিকে আনন্দিত করেছে। কেননা তাতে স্বদেশীয় নারীর উপকার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। হয়ত সেজন্যই কবি পুলকিত হয়ে বলেন বহুদিন পরে অবলা নারীদের সুদিন আসতে চলেছে। কবির ভাষায় ;—

" বঙ্গের অবলাগণ। এত দিন পরে,
পোহাইল আমাদের বিষাদ-শর্ব্বরী ;
কি সুখের স্রোত আজি বহি'ছে অন্তরে,
পুলকে কোমল অঙ্গ উঠি'ছে শিহরি'
ঘুচাইতে অবলার দুরদৃষ্ট সব,
মিলাইল বিধি এই অবলা-বান্ধব।"(৬১)

যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্তৃক বিখ্যাত 'আর্য্যদর্শন' (১২৮১ বঙ্গাব্দ)পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই উপলক্ষে 'আর্য্যদর্শন' কবিতাটির সৃষ্টি। সূচনায় কবি বলেছেন 'আর্য্য' নাম কেন উচ্চারণ করা হল। একসময় যে আর্যজাতির গৌরব পৃথিবী খ্যাত ছিল, সেই আর্য জাতি এখন নিস্তেজ।কবি লিখেছেন;—

এই নহে আর্য্যাবর্ত্ত;
আমরাও নহি সেই আর্য্যের কুমার ;"(৬২)

—কবি নবীনচন্দ্র সেন সমকালের আর্যজাতির দুরবস্থার জন্য বেদনা বোধ করেছেন। কবি হতাশ হয়ে বলেন —

" কি দোষে না জানি , হায়!
বিধাতার কাছে দোষী আমরা সকল,
তেজোহীন, বীর্য্যহীন;
ততোধিক পরাধীন;—
আমাদের-হায়! কোন্ পাপের এ ফল ?
করে ভিক্ষা-পাত্র,—কণ্ঠে দাসত্ব-শৃঙ্খল।"(৬৩)

"মাইকেল মধুসূদন দত্ত' কবিতাটি বাংলার অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিয়ে রচিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসসূদন দত্তের পরলোক গমনের বিষয়টি কবি নবীনচন্দ্র সেন মেনে নিতে পারেন নি। মধুসূদনের অসহায়ভাবে মৃত্যুতে নবীনচন্দ্র মর্মাহত। তিনি দুঃখ করে বলেন;—

"হা অদৃষ্ট !—কবিবর! এই কি তোমার
ছিল হে কপালে ?
— — —
দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ ?"(৬৪)

মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের কবি মধুসূদনের মৃত্যুতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষতি হবে এই বিষয়টি নবীনচন্দ্রকে আহত করেছিল। কবি লিখেছেন ;—

"শূন্য হ'ল আজি বঙ্গ-কবি-সিংহাসন,
মুদিল নয়ন
বঙ্গের অনন্য কবি, কল্পনা-সরোজ-রবি,
বঙ্গের কবিতা-মধু হরিল শমন।"(৬৫)

—পরিশেষে কবি নবীনচন্দ্র সেন সুগভীর শ্রদ্ধা সহকারে কবি মধুসূদনের উদ্দেশ্যে বলেন;—

"যাও তবে, কবিবর! কীর্ত্তিরথে চড়ি'
বঙ্গ আঁধারিয়া,
যথায় বাল্মীকি, ব্যাস ভবভূতি, কালিদাস,
রহিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া।
যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া,
কবিতা-ভাণ্ডারে;
অনন্ত কালের তরে, গৌড়-মন-মধুকরে
পান করি', করিবেক যশস্বী তোমারে।"(৬৬)

স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন মদ্যপান বিষপানের তুল্য। উনিশ শতকে বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগে অনেকে মদ্যপানে আসক্ত ছিল। বাঙালীর মদ্যপানকে কেন্দ্র করে কবি নবীনচন্দ্র সেন 'বাঙ্গালীর বিষপান' কবিতা রচনা করেন। মদ্যপান বাঙালীর জীবনে বিষপানের তুল্য—কবি সেকথা বলতে ভোলেন নি। তাঁর মতে—জ্ঞান, বুদ্ধি, নীতি, ধর্ম, লজ্জাবোধ, জাতীয় গৌরব সবই এই বিষের তেজে বিনাশ হয়। কবির ভাষায়;—

"জ্ঞান, বুদ্ধি, লজ্জা, ভরসা, বিশ্বাস,
নীতি, ধর্ম্ম, সত্য, জাতীয় গৌরব,
এই বিষ-তেজে হইবে বিনাশ!
একা সুরা বঙ্গে বিনাশিবে সব!"(৬৭)

—'বাঙ্গালীর বিষপান' কবিতায় নবীনচন্দ্র সেন রঙ্গব্যঙ্গের পরিচয় রেখেছেন। কবি এখানে ইঙ্গিতে পরাধীনতার গ্লানিকে প্রকাশ করেন। তাঁর মতে বাঙালীর দুঃখের সীমা নেই, এই দুঃখ ভুলতে হলে মদ্যপান একান্ত প্রয়োজন। কবি বলেন;—

"অধীনতা-দুঃখ করিতে বিনাশ,
চিত্তে স্বাধীনতা করিতে সঞ্চার;
মহৌষধি এই ব্রাণ্ডির গেলাস!"(৬৮)

—এখানে মদ্যপানকে কেন্দ্র করে কবি নবীনচন্দ্র সেন বাঙালীর পরাধীনতাকে কৌশলে প্রকাশ করেছেন।

বঙ্গমাতার অনন্ত দুঃখের বিষয় নিয়ে কবি নবীনচন্দ্র সেন 'অনন্ত দুঃখ' কবিতাটি লেখেন। তিনি এই কবিতায় বিধাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ বলেন;—

"রে বিধাতা! নির্দ্দয় হৃদয়!
বাঙ্গালীর এত দুঃখ— এত যন্ত্রণায়,—
পূরিল না তথাপি কি উদর তোমার?"(৬৯)

কবি বলেছেন— ব্যাধি, দুর্যোগ, রাজনৈতিক পরাধীনতার যন্ত্রণা নিয়েও বঙ্গমাতা কৃতি সন্তানকে বুকে আগলে দিন কাটাত। কিন্তু বিধাতার এতেও নজর পড়ে। বিধাতা বঙ্গমায়ের কৃতি সন্তান মধুসূদন, কিশোরী চাঁদ ও দীনবন্ধুকে হরণ করে। বঙ্গমায়ের এর চেয়েও অধিক দুঃখ আর কিছু নেই।

দেশীয় কৃষকের কল্যাণের জন্য নীলকরের বিরুদ্ধে দীনবন্ধু মিত্রের গর্জে ওঠা লেখনী, তাঁর বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন প্রভৃতি কৃতকর্মের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। কবি বঙ্গমায়ের অনন্ত দুঃখে হতাশ হয়ে বলেন;—

"আর কত দিন এই দুঃখের অনল
র'বে প্রজ্বলিত বঙ্গে ? শুনিয়াছি ভবে
সকলের শেষ আছে, সকলেই মরে বাঁচে,
ধরাতলে কিছু নাহি চিরদিন রবে;"(৭০)

এখানে কবি নবীনচন্দ্র সেন মাতৃভূমির চিরদুঃখের জন্য গভীর বিলাপ করেছেন। পরিশেষে কবি প্রকৃতির উত্থান-পতনের অমোঘ নিয়মের মধ্যেই স্বদেশের অনন্ত দুঃখের অবসান দেখতে পেয়েছেন। আর সেজন্যই নবীনচন্দ্র সেন প্রশ্ন করেন;—

"বঙ্গের কি দুঃখ, আহা! অনন্ত কেবল?" (৭১)

উচ্চ-শিক্ষার জন্য যারা বিদেশ গিয়ে সুশিক্ষা লাভের পরিবর্তে অনুকরণকেই অপরিহার্য বলে মনে করে, তাদের বাণবিদ্ধ করে 'চিহ্নিত সুহৃদ' কবিতাটি রচিত। বন্ধু বিদেশের শিক্ষা শেষ করে ফিরলে কবি বলেন—তুমি বঙ্গমায়ের জন্য কি মহামূল্য ধন বিদেশ থেকে এনেছ ? নবীনচন্দ্র সেনের ভাষায়;—

"অকূল, দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধু অতিক্রমি',
বীরত্বের খনি ব্রিটনে পশিয়া;
জগত-জীবন ইউরোপে ভ্রমি',
আসিয়াছ, সখে! কি ফল লভিয়া?" (৭২)

—কবি অনুকরণপ্রিয়তায় আহত। দেশমাতৃকাকে সেবা করার মতো তার শিক্ষা বা চেতনা বন্ধুর নেই। কবি লিখেছেন;—

"ইংরাজের শ্মশ্রু, ইংরাজের কেশ,
ইংরাজি আহার— প্রিয় ব্রাণ্ডিজল,
আনিয়াছ, সখে! ইংরাজের বেশ,
কিন্তু ইংরাজের কই বীর্য্য-বল?
কই ইংরাজের তীক্ষ্ণ তরবার?
কই ইংরাজের দুর্জ্জয় কামান?
কই ইংরাজের সাহস অপার?"(৭৩)

কবি চেয়েছেন— বিদেশে গিয়ে অনুকরণ নয় বরং বিদেশীদের অন্তর্সম্পদ সাহস, শৌর্য, বীর্যের মতো শিক্ষা লাভ করলে স্বদেশের মঙ্গল। বন্ধুর মধ্যে এসব কিছু দেখতে না পেয়ে কবি বলেন;—

"সিংহচর্ম্মে তুমি মেষ অল্পপ্রাণ!"(৭৪)

কিংবা,

"হ'য়েছ "চিহ্নিত"! — কিন্তু সেই চিহ্ন
তব পক্ষে, হায়! কলঙ্ক কেবল,
সেই চিহ্নে, সখে! হইবে না ছিন্ন
দীনা ভারতের অদৃষ্ট-শৃঙ্খল!" (৭৫)

ভাবী ভারতেশ্বর যুবরাজ এডোয়ার্ড-এর ভারত আগমন উপলক্ষে ভারতবাসীর উচ্ছ্বাসকে বিষয় করে 'ভারত উচ্ছ্বাস' কবিতাটি রচিত। কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রশ্ন করেন,— যুবরাজ কেন ভারতে আসবেন? —

"হায়! রাজপুত্র, কি দেখিতে হায়!
পতিতা ভারতে তব আগমন?
ভারতের কীর্ত্তি এবে স্বপ্নপ্রায়;" (৭৬)

আসলে প্রাচীন ভারতের যে গৌরবময় কীর্তি বা ঐতিহ্য ছিল — তা স্বপ্নপ্রায়। সমকালের সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প সবই পাশ্চাত্যের প্রভাবযুক্ত। কবি দুঃখ করে বলেন, এই ভারত বস্ত্র শিল্পে একসময় জগৎ বিখ্যাত ছিল, অথচ আজ ভারতবাসী লজ্জা নিবারণ করে মেনচেষ্টার থেকে আনা কাপড় দিয়ে। এদেশে লবণ সম্পদ প্রচুর অথচ লবণ সংগ্রহ করা হয় 'লিবরপুল' থেকে। তাই কবি বলেন;—

"হায়! যুবরাজ, এই পরিণাম
শতবর্ষ তব দাসত্ব করিয়া?
ভারতের বল, বীর্য্য, কীর্ত্তি, নাম,
চিরদিন তরে গেল কি নিবিয়া?"(৭৭)

মহাভারতের বীর্যবান জাতির বিভীষিকাময় যুদ্ধের কথা, রাজপুত রাণার বিক্রমের ইতিহাস ও সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজের আতঙ্ক, বীর প্রসবিনী পাঞ্জাব প্রভৃতি আজ শুধু ইতিহাসের স্মৃতিতে। বাস্তবে এখন আর কিছুই নেই। কবির ভাষায়;—

"আজি সে জাতির ভস্মরাশি হায়!
সিন্ধু-জাহ্নবীর নর্ম্মদার তীরে
পড়ে আছে; ক্রমে বিধির ইচ্ছায়
হইবে বিলীন কালসিন্ধু-নীরে।" (৭৮)

এইসব বক্তব্যে স্বদেশের দুরবস্থার জন্য কবিমনের বেদনা ধ্বনিত হয়েছে।

'অবকাশরঞ্জিনী'র প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগে বাংলা তথা ভারতের উন্নতির জন্য কবি নবীনচন্দ্র সেন নানাভাবে প্রেরণা বা উৎসাহ দিয়েছেন। যা তাঁকে অকৃত্রিম দেশানুরাগী কবি হিসাবে পরিচিত হতে সাহায্য করে।

৩। গীতিকবিতার আস্বাদ ও বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা ঃ

বাংলা গীতিকবিতার প্রথম শিল্পরূপ দানের বিশেষ কৃতিত্বের জন্য 'উনিশ শতকের গীতিকাব্যে স্বদেশ ভাবনা' অধ্যায়ের গীতিকবিতার আস্বাদ ও বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা নামক পর্বে পৃথকভাবে মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) গীতিকবিতা আলোচিত হচ্ছে। মধুসূদন দত্তের হাতে প্রথম আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রাণ ও দেহ শিল্পরূপ লাভ করে। তাঁর কবিতায় আমরা প্রথম সুতীব্র ব্যক্তিক অনুভূতি লক্ষ করি। প্রসঙ্গত— 'বঙ্গভাষা' কবিতার কথা বলতে পারি—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;-
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশ, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
— — —
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমলকানন!" (৭৯)

এই কবিতায় কবি মনের অনুশোচনার এক সুগভীর অনুভুতি কাব্যরূপ লাভ করেছে। আর আধুনিক গীতিকবিতার গঠন বিষয়ে মধুসূদন দত্তই প্রথম স্পষ্ট ধারণা দেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে তাঁর রচিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'বঙ্গভাষা', 'কপোতাক্ষ নদ', 'কালিদাস'-এর মতো একাধিক সনেটের কথা বলতে পারি।

আমরা লক্ষ করব মধুসূদন গীতিকবিতা নামক প্রকরণে বাঙালিয়ানাকে অকৃত্রিম ভাবে প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তিগত জীরনে যতই তিনি বিদেশী সংস্কৃতিতে অনুরক্ত হন না কেন তাঁর গীতিকবিতাগুলি পাঠ করলে তাঁকে বাঙালী কবি বলেই মনে হবে। মধুসূদনের রচিত গীতিকাব্যের আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এখানে ধারাবাহিকভাবে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১), 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) ও কোনো কাব্যগ্রন্থ ভুক্ত হয় নি এমন কয়েকটি কবিতার আলোচনা করা হয়েছে।

'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' (১৮৬১)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য'টিকে 'ওড' বলে জানিয়েছেন। কবি স্বীকৃতি ও কবিতাগুলির কানায় কানায় 'ওড'-এর সুর ধ্বনিত হওয়ায় 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য'টিকে গীতিকাব্যের প্রকরণে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

'ব্রজাঙ্গনাকাব্য'-এর বিষয় হল কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনী ব্রজের শ্রীমতী রাধার বিরহের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। স্বভাবতই একটি প্রশ্ন জাগতে পারে মধুসূদন দত্ত গ্রীক, ইংরেজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্যরস-আস্বাদন করার পরেও কিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আদি-মধুর রস নির্ভর 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' রচনা করলেন। আমরা জানি, প্রথম জীবনে মধুসূদন ভিন্ন মত পোষণ করলেও পরবর্তীকালে স্বদেশীয় ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন। যার সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অধিকাংশ কবিতা। এখানে নিজ দেশের কবি, কাব্য, মনীষী, সংস্কৃতি, জাতীয় ঐতিহ্য প্রভৃতির প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্য বাঙালীর প্রাণের সামগ্রী। মধুসূদন বাঙালীর জাতীয় সামগ্রীকে এড়াতে পারেন নি। আদি মধুররস প্রধান বিষয়কে কাব্য রূপ দিয়ে পক্ষান্তরে তিনি জাতীয় ভাবধারা প্রধান সাহিত্য চর্চা করেন। তবে মধুসূদন যুগস্রষ্টা কবি। প্রাচীনের যথাযথ অনুকরণকারী প্রতিভা তাঁর নয়, তিনি বাঙালীর বৈষ্ণব সাহিত্যের চিরাচরিত রাধার সংস্কার করে বৈষ্ণব সাহিত্যকে যুগমানসের উপযোগী করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর বৈষ্ণব কাব্য 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' থেকে ধর্ম ও তত্ত্বকে সরিয়ে মানবী রাধার কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ ফুটিয়ে তোলেন। এ বিষয়ে মধুসূদন-জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন;—

> "জয়দেব অথবা বিদ্যাপতি, শ্রীরাধিকাকে যে ভাবে দর্শন করিয়া, তাঁহাদিগের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, 'ব্রজাঙ্গনা'য় সে ভাব নাই। মধুসূদনের রাধা ভক্ত বৈষ্ণবের পরমাপ্রকৃতি রাধা নহেন; বিরহ-বিধুরা রমণীমাত্র। তাঁহার বৃন্দাবন অপ্রাকৃতিক বৃন্দাবন নহে, সুরম্য উপবন মাত্র। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ নহেন, প্রেমিক মনুষ্য মাত্র।" (৮০)

বৈষ্ণব কবিগণ মধ্যযুগ থেকে ধর্ম ও তত্ত্বের আবরণে রাধা-কৃষ্ণের যে প্রেম কাহিনীর ছবি অঙ্কন করেন, মধুসূদন দত্ত সেই চিরাচরিত ছবির সংস্কার করেন। মধুসূদন দত্তের এরকম মহৎ কর্ম একাধারে তাঁর দেশীয় সাহিত্য প্রীতি ও সাহিত্যের মানোন্নয়নের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) ও সমধর্মী অন্যান্য কয়েকটি কবিতা ঃ

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' পাঠ করতে গিয়ে মধুসূদনের শিক্ষা, রুচি, আভিজাত্য এবং এই কাব্যের কয়েক জন বিদেশী ব্যক্তিকে নিয়ে রচিত কবিতার কথা ছেড়ে দিলে কবিকে বাংলার খাঁটি বাঙালী কবি বলেই মনে হবে। কবি এখানে যা বলেছেন তা একেবারে তাঁর নির্ভেজাল মনের কথা। এই মনের কথার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুর হল স্বদেশ ভাবনা। একদা দেশমাতৃকার অঞ্চল ছেড়ে কবি বিশ্বমায়ের কোলে সম্মানের সঙ্গে ঠাঁই পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিফল হয়ে কবি মধুসূদন পুনরায় ফিরে এসেছেন অনুতাপের সুর নিয়ে বঙ্গভারতীর কোলে। আর এজন্যই বিদেশে অবস্থানকালে লেখা এই কবিতাগুলিতে ঠাঁই পেয়েছে বঙ্গভারতীর যাবতীয় বিষয়ের প্রতি কবি-হৃদয়ের প্রগাঢ় ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' ও সমধর্মী কিছু কবিতায় কবি মধুসূদন দত্ত প্রকাশ করেছেন মাতৃভাষা, জন্মভূমি, বাংলা সাহিত্যের কবি, কাব্য, বিখ্যাত কিছু চরিত্র, সংস্কৃত সাহিত্যের কবি, কাব্য, কাব্যের বিষয়, বিখ্যাত চরিত্র, ভাষা, দেশীয় দেব-দেবী ও উৎসবের গুরুত্ব, দেশের প্রকৃতি এবং সমকালের দেশহিতৈষী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা। উল্লিখিত বিষয়গুলি নিম্নে আলোচিত হয়েছে।

মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতার কবিতা ঃ

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মাতৃভাষা বন্দনামূলক কবিতা 'বঙ্গভাষা' নামক সনেটটি। কবি বঙ্গভাষার বিবিধ রতন ছেড়ে বিজাতীয় ভাষার সেবা করে অতুল সম্মানের অধিকারী হতে চেয়ে যে ভুল করেছেন, সে বিষয়ে কবির গভীর অনুশোচনা প্রকাশিত হয়েছে। আমরা পূর্বেই একবার উল্লেখ করেছি, প্রসঙ্গত পুনরায় উল্লিখিত হল। কবি লিখেছেন;—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;-
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশ, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!

— — —

কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমলকানন!" (৮১)

এছাড়া অন্যান্য গীতিকবিতাগুলির মধ্যে 'কবি মাতৃভাষা' মধুসূদনের বিখ্যাত কবিতা। এই কবিতায়ও মাতৃভাষা ছেড়ে কবির বিদেশী ভাষা প্রীতির জন্য অনুশোচনা ব্যক্ত হয়েছে। কবির ভাষায়;—

"নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি," (৮২)

মাতৃভূমি বিষয়ক ঃ

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে 'সমাপ্তে' সনেটটি মাতৃভূমির প্রতি কবির প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও মমতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি জন্মভূমির প্রতি অনুশোচনার সুরে বলেন;—

"নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;"(৮৩)

—কবি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছেন;—

"এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ-ভারত-রতনে!"(৮৪)

'ভারত-ভূমি' কবিতাটিও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। একদা ঐশ্বর্যময়ী ভারতমাতার বর্তমান ভিখারী দশা কবিকে ব্যথিত করে তোলে —

"কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ; সুধা তিত অতি?"(৮৫)

—এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত নয় এমন কিছু কবিতাতেও মাতৃভূমির প্রতি দরদ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন 'বঙ্গভূমির প্রতি' এবং 'আত্মবিলাপ' কবিতা দু'টি। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি মধুসূদন বঙ্গমায়ের একটুখানি স্নেহ বা ভালোবাসা প্রার্থনা করেছেন। কবি বলেন;—

"রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।"(৮৬)

—'আত্মবিলাপ' কবিতায়ও কবি প্রথম জীবনের নীচ কর্মের জন্য অনুশোচনা বা বিলাপ করেছেন। কবি বলেন;—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়
ফিরাব কেমনে ?

— — —

যশোলাভ লোভে আয়ু, কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে?" (৮৭)

কেননা পরবর্তীকালে কবি বুঝতে পেরেছেন জন্মভূমি ও জন্মভূমির অনেক বিষয়ের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তিনি মহাভুল করেছেন। এই গর্হিত কাজটি কবিকে ব্যথিত করে তোলে, যার ফলে 'আত্মবিলাপ' কবিতাটি রচিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে কবি, কাব্য ও বিখ্যাত কিছু চরিত্র ঃ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যরস উপলব্ধি করলেও বাংলা সাহিত্যকে কতখানি আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন তার দৃষ্টান্ত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র বাংলা সাহিত্যের কবি, কাব্য ও চরিত্রকে নিয়ে রচিত সনেটগুলি।

'কৃত্তিবাস' সনেটে বাংলা রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস সম্বন্ধে মধুসূদন বলেন;—

"যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে," (৮৮)

'কাশীরাম দাস' সনেটে বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের কবি কাশীরাম দাস সম্বন্ধে কবি মধুসূদন বলেন;—

"হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।।" (৮৯)

বাংলা মঙ্গল কাব্যের এক বিখ্যাত কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী সম্বন্ধে কবির বক্তব্য;—

"শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে! যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী!" (৯০)

বাংলা কাব্য বিষয়ে মধুসূদন কয়েকটি সনেট লিখেছেন। যেমন 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের অংশ নিয়ে 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি'। এই সনেটে কবি লিখেছেন;—

"...অন্নদামঙ্গল—

যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,

রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।।" (৯১)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অংশ নিয়ে 'কমলে কামিনী' সনেটটি মধুসূদন রচনা করেন। 'চণ্ডীমঙ্গল' তথা 'কমলে কামিনী'র বঙ্গদেশে অসাধারণ জনপ্রিয়তাকে কবি প্রকাশ করেন এই ভাবে—

"বঙ্গ-হ্রদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী'।। (৯২)

বাংলা কাব্যের চরিত্রও মধুসূদনের মনকে প্রভাবিত করেছিল। তার সার্থক উদাহরণ 'ঈশ্বরী পাটনী' ও 'শ্রীমন্তের টোপর' নামক সনেট দু'টি।

সংস্কৃত সাহিত্যের কবি, কাব্য, বিষয়, কিছু চরিত্র ও সংস্কৃত ভাষা ঃ

সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত কবি বাল্মীকি, কালিদাস প্রমুখ কবিকে নিয়ে মধুসূদন দত্ত সনেট রচনা করেন। তাঁর 'বাল্মীকি' সনেটে রামায়ণের মহাকবি বাল্মীকিকে এদেশের 'কবি-কুল-পতি' (৯৩) রূপে বরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে কালিদাস সম্পর্কে মধুসূদন বলেন;—

"কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি!" (৯৪)

কবি আরো বলেন;— "সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে

(পুণ্যভূমি!) হে কবীন্দ্র, সুধা বরিষণে," (৯৫)

সংস্কৃত সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার বিখ্যাত কবি জয়দেব সম্বন্ধে অনুরূপ বন্দনা করেন 'জয়দেব' নামক সনেটটিতে।

সংস্কৃত কাব্য বললে এদেশের মানুষের প্রথমে মনে আসে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' নামক মহাকাব্য দু'টির কথা। কবি মধুসূদন অসাধারণ প্রতিভার বলে জাতীয় মহাকাব্য দু'টিকে সনেটের রূপে ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপ দান করে মহাকাব্য দু'টির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সংস্কৃত কাব্যের বিষয়ও কবিকে প্রভাবিত করেছে। যেমন দুর্যোধন ও ভীমের বিখ্যাত গদাযুদ্ধকে নিয়ে

'গদাযুদ্ধ', কৌরব পাণ্ডবের বিভীষিকাময় যুদ্ধের বিষয়কে নিয়ে 'কুরুক্ষেত্র' সনেট দু'টি রচিত হয়।

গদাযুদ্ধের কথা বললেই মনে পড়ে মহাভারতে দুই বীর গদাধারী দুর্যোধন ও ভীমের কাহিনী। কবি মধুসূদন এদেশের এরকম একটি অবিস্মরণীয় বিষয় নিয়ে সনেট রচনা করেন।

মহাভারতের ভ্রাতৃঘাতী কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধও এদেশে চিরস্মরণীয়। কবি এরকম একটি স্মরণীয় বিষয়কে নিয়ে সনেট লিখবেন না — তা ঠিক নয়। মহাভারতের অন্যতম একটি শোকাতুর বিষয় বালক অভিমন্যু বধের কাহিনী। মধুসূদন বিষাদময় অভিমন্যু বধের বিষয়কে 'কুরুক্ষেত্র' নামক সনেটে স্থান দিয়েছেন। এছাড়া বাঙালী তথা ভারতবাসীর হৃদয় হরণ করেছে এমন কিছু বিষয়কে নিয়েও মধুসূদন দত্ত সনেট লিখেছেন। যেমন—'সুভদ্রা-হরণ', 'সীতা-বনবাস' প্রভৃতি।

সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি থেকে কবি মধুসূদন দত্ত বিশেষ কিছু চরিত্রকে নিয়ে সনেট লিখেছেন। যেমন—'সুভদ্রা', 'উর্বশী', 'দুঃশাসন' 'হিড়িম্বা', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি। এইসব চরিত্র বাঙালী তথা এদেশবাসীর মনে স্থায়ী দাগ কেটে আছে।

মধুসূদন দত্ত সংস্কৃত ভাষাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। কবির এই শ্রদ্ধাবোধ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'সংস্কৃত' নামক সনেটে প্রকাশিত। কবি আশা করেন সংস্কৃত ভাষার গৌরবময় দিনগুলি ফিরে আসুক। কবির ভাষায়;—

"... পূর্ব-রূপধরি,

ফোট পুনঃ পূর্বরূপে, পুনঃ পূর্ব-রসে!" (৯৬)

দেশীয় দেব-দেবী ও উৎসব ঃ

মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে দেব-দেবী ও উৎসব বিষয়ক উল্লেখযোগ্য সনেটগুলি হল—'সরস্বতী', 'শ্রীপঞ্চমী', 'দেবদোল', 'বিজয়াদশমী', 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা' দেবীদুর্গার পূজা উপলক্ষে 'আশ্বিন মাস' প্রভৃতি সনেট। এইসব সনেটে দেশীয় দেব-দেবী ও উৎসবই মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

সমকালের দেশহিতৈষী ব্যক্তি বিষয়ে ঃ

এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সনেট দু'টি হল 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর' ও 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর' কবিতায় বাংলা মায়ের কৃতি সন্তান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশাল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা বড় হয়ে উঠেছে। 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামক সনেটটিতে বিদ্যাসাগরের 'সহৃদয় হৃদয়সংবাদী' দিকটি উজ্জ্বল হয়ে

উঠেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়;—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!" (৯৭)

স্বদেশের প্রকৃতি ঃ

কবি মধুসূদন দত্ত বাংলাদেশের প্রকৃতিকে তাঁর সনেটে স্থান দিয়ে। যেমন—'কপোতাক্ষ নদ', 'বটবৃক্ষ' প্রভৃতি।

'কপোতাক্ষ নদ' পূর্ব বঙ্গের একটি ছোট নদী। এই নদীটির সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় ছেলেবেলা থেকে। বহুদিন পরে বিদেশে অবস্থানকালে কবির স্মৃতিতে এই ছোট নদীটি সনেটের আকার পেয়ে অমরতা লাভ করে। কবির ভাষায়—

"সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;"(৯৮)

'বটবৃক্ষ' সনেটটিতে বটবৃক্ষ এদেশের মানুষের জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তারই চিত্র ফুটে উঠেছে। কবির ভাষায় ;—

"দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি!
জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া সু-সুন্দরী,
— — —
দেব নহ; কিন্তু গুণে দেবতার মত।" (৯৯)

—অতএব মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' যেন বাংলা ভাষায় বাংলা দেশেরই কবিতা। যার মূল সুর স্বদেশের প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি কবির আন্তরিক মমতা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে নিহীত।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ভাবধারার প্রবর্তন করতে গিয়ে মধুসূদন স্বদেশ, স্বসমাজকে ভুলে যান নি। এই বিশেষ তথ্যটি তাঁর অন্যান্য রচনার মতো গীতিকাব্যতেও প্রকট। বলা যায় — যা মধুসূদনের মনের স্বদেশ ভাবনাকেই ফুটিয়ে তোলে।

বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ গীতিকবিতা ও বাঙালীর স্বদেশভাবনা ঃ

মধুসূদন দত্তের দ্বারা গীতিকবিতায় ব্যক্তিক অনুভূতি যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা বা শিল্প সার্থকতা লাভ করে বিহারীলাল চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে সেই গীতিকবিতার প্রাণ ছন্দোময় বা আরো ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়েছিল। বাংলা গীতিকাব্যে এবার কল্পনা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের সার্থক মেলবন্ধন হল। শুধু তাই নয়, গীতিকবিতার গঠন কত বিচিত্র হতে পারে তা রবীন্দ্রনাথের রচিত গীতিকবিতায় লক্ষ করা যায়। বিহারীলাল চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথের হাতে উনিশ শতকে বাংলা গীতিকবিতার বিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়—এমন মন্তব্য করলে অত্যুক্তি হবে না। আমরা উনিশ শতকের বিশুদ্ধ বাংলা গীতিকবিতায় স্বদেশ ভাবনা বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ গীতিকবিতা ও বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা নামক পর্বে বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গীতিকবিতা আলোচনা করব।

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মধুসূদন দত্তের পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐশ্বর্যপূর্ণ কাব্যসম্ভারের পূর্বে গীতিকবিতা রচনার ক্ষেত্রে বিহারীলাল চক্রবর্তী এক অবশ্য স্মরণীয় নাম। বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন এই রকম;—

> "সে প্রত্যুষে লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের। ...আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।" (১০০)

যখন বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ গীতিকবিতার অভাব, ঠিক সেই সময় বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের আধুনিক গীতিকবিতার ভোরে সুমিষ্ট সুরে গান গেয়ে বাঙালীর গীতিকবিতাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। বিহারীলাল তাঁর 'সারদামঙ্গল' কাব্যের সম্বন্ধে 'শ্রীযুক্তবাবু অনাথবন্ধু রায়'কে 'কবির একখানি পত্র'-এ বলেন;— "মৈত্রী বিরহ, প্রীতি বিরহ, সরস্বতী বিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল রচনা করি।"(১০১) এবং কাব্যের উদ্দেশ্যের প্রসঙ্গে বলেন;—"...আমি কোন উদ্দেশ্যেই সরদামঙ্গল লিখি নাই।" (১০২) —কবির এরকম ঘোষণার পিছনে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সমকালের কাব্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেন;—

> "বিহারীলাল তখনকার ইংরাজিভাষায়—নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না— তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না।" (১০৩)

'সারদামঙ্গল' কাব্যের বিষয়বস্তু অবশ্য কোন প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যের কথা বলে না। অর্থাৎ সমকালের যুগের দাবী মতো কোন উদ্দেশ্য 'সারদামঙ্গল'-এ না থাকায় হয়ত কবি স্বয়ং কাব্যটিকে উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কাব্যগ্রন্থ বলে মন্তব্য করেন। কবির এই মন্তব্য 'সঙ্গীত শতক' (১৮৬২), 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০), 'নিসর্গ সন্দর্শন' (১৮৭০), 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), প্রভৃতি একাধিক কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বিহারীলালের কাব্যচর্চায় প্রত্যক্ষ দেশপ্রেম বা সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য না থাকলেও কাব্যচর্চার দ্বারা পরোক্ষে বাংলা গীতিকাব্য সংস্কার করার মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। বিহারীলালের হাতেই বাংলা গীতিকবিতা প্রথম বিশুদ্ধতা পেয়েছে। আর সেজন্যই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ভোরের পাখি' বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

প্রশ্ন জাগতে পারে বিহারীলাল চক্রবর্তী 'উদ্দেশ্য'হীন কবিতা লিখতে গিয়ে কি কোনদিনও সমকালের উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করেন নি? সমকালের জাতীয় উত্তেজনা কি কবি মনকে কোন দিনও আন্দোলিত করে নি ? কবির সমগ্র রচনাবলী পাঠ করলে এরকম মনে হবে না। 'স্বপ্নদর্শন' নামক গদ্যরচনায় কবিমনের দেশানুরাগ ধ্বনিত হয়েছে। কবি স্বপ্ন দেখেছেন, স্নেহময়ী বঙ্গমাতা বাঙালীর আসন্ন বিপদের কথা জেনে উদ্বিগ্ন। এতে কবি মর্মাহত;—

> "হা আমার প্রিয় জন্মভূমি! তোমার এ কি দশা হইয়াছে? হা আমার স্বদেশীয় ভ্রাতা সকল! তোমরা কোথায় গমন করিয়াছ ? যে আমি তোমাদের সহিত একস্থানে জন্মিয়াছি, যে আমি তোমাদের সহিত লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, যে আমি তোমাদের সহিত কত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি, কতই হাস্য করিয়াছি; হা! সেই আমাকে তোমাদের কঙ্কালমাত্র পতিত দেখিতে হইতেছে! হা কঠিন হৃদয়! কেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না ? হা তাত! হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা অধিদেবতে! তোমরা কোথায়? ....এই প্রকার খেদ করিতে করিতে আমার শোকাবেগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া যেন হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। অমনি চমকিয়া উঠিয়া দেখি, গত রজনীতে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, সেই শয্যায়ই পতিত রহিয়াছি।" (১০৪)

বঙ্গমায়ের দুর্দশা যে কবিমনে ব্যাকুলতা সৃষ্টি করেছিল 'স্বপ্নদর্শন'-এর উল্লিখিত রচনাংশে তা প্রমাণিত।

বাংলা সাহিত্যে বিহারীলাল গীতিকবি হিসাবেই পরিচিত। আমরা অনুসন্ধান করব তাঁর কবিতায় কোনরকম দেশানুরাগ ধ্বনিত হয়েছে কি না। 'শরৎকাল' কাব্যের 'নিশীথসঙ্গীত'-এ কবি বিহারীলাল স্বদেশীয়

কাব্য সাহিত্যের প্রতি গভীর মমতা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ভাষায়;—

"এখন ভারতে ভাই,
কবিতার জন্ম নাই,
গোরে বোসে অট্টহাসে কে রে কার ছায়া ?
হা ধিক! ফেরঙ্গ বেশে
এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস্ সব উল্কি-মুখী আয়া?" (১০৫)

—দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের তুলনায় সমকালের কাব্য সাহিত্যের অপ্রতুলতা বা অনুৎকর্ষতা কবিকে ব্যথিত করেছে। একজন কবি যখন মাতৃভাষা তথা স্বদেশীয় কাব্য সাহিত্যের দুর্দশার চিত্র উপলব্ধি করবেন, তখন তিনি সেই দুর্দশার অবসান ঘটাতে চাইবেন না—তা কিন্তু হতে পারে না। উল্লিখিত পংক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী পরোক্ষে বাংলা কাব্যের উন্নয়নে যত্নবান ছিলেন। 'নিসর্গসন্দর্শন' নামক কাব্যের 'চিন্তা' ও 'সমুদ্রদর্শন' কবিতায় কবির দেশানুরাগ স্পষ্ট। 'চিন্তা' কবিতায় সমকালের পরাধীনতার জন্য কবি উদ্বিগ্ন। কবি বলেন;—

"যখন জনমভূমি ছিলেন স্বাধীন,
কেমন উজ্জ্বল ছিল তাঁহার বদন!
এখন হয়েছে মা'র সেমুখ মলিন!
মন-দুখে পরেছেন তিমির বসন!"(১০৬)

—পরাধীনতার জন্য কবি বিহারীলালের অকৃত্রিম যন্ত্রণার অনুরূপ প্রকাশ এই কাব্য গ্রন্থেরই 'সমুদ্রদর্শন' নামক কবিতাটি। সমুদ্রের রূপ দেখতে দেখতে কবির দেশমাতৃকার কথা মনে হয়েছে। তাঁর ভাষায় ;—

"হা হা মাত, আমরা অসার কুসন্তান,
কোন্ প্রাণে ভুলে আছি তোমার যন্ত্রণা!
শত্রুগণ ঘেরে সদা করে অপমান,
বিষাদে মলিনমুখী সজল নয়না!" (১০৭)

—এখানে কবি দেশমাতৃকার যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছেন। দেশমাতৃকার যন্ত্রণার জন্য তিনি নিজেদের দায়ী করেন। কেননা উপযুক্ত সন্তানের কর্তব্য মাতৃভূমির যন্ত্রণার অবসান ঘটানো। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর

এজাতীয় রচনা তাঁর অন্তরের অকৃত্রিম দেশানুরাগের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

অতএব বিহারীলালও স্বদেশের দুর্দশায় মর্মাহত ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বদেশ ভাবনার অমর কবি নন। তিনি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ গীতিকবিতার স্রষ্টা হিসাবেই বিখ্যাত। তাঁর কাব্যকে আদর্শ করে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-৭৮) অক্ষয় কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) এমন কি প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গীতিকবি কাব্য চর্চা করেছিলেন। সেজন্যই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিহারীলালকে কাব্যগুরুর মর্যাদা দিয়েছেন।

এই পর্বের বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথের কাব্য জীবন অতি দীর্ঘ। এই দীর্ঘ কাব্য জীবনে বার বার 'পালাবদল' হয়েছে। আমাদের আলোচনার সীমারেখা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ে রবীন্দ্রকাব্য শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পড়েছে। আমরা দেখব — রবীন্দ্রনাথ সমকালের জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে ভেবেছেন। সাহিত্য রস-সাধনার সঙ্গে দেশ ও জাতির চেতনাহীনতা, দরিদ্রতা, পরাধীনতা, ভীরুতা, অনুকরণপ্রিয়তার মতো নানা সমস্যা কবিকে ভাবিয়েছে। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উক্ত সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর উনিশ শতকের গীতিকবিতায় দেশের দৈন্যাবস্থা, বাঙালীর লক্ষহীন স্তব্ধ জীবনের সমালোচনা, সত্য ও সুন্দরকে গ্রহণ করে জীবনের উৎকর্ষতা সৃষ্টিতে উৎসাহ, বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করতে আন্তরিক প্রয়াস, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি অন্যতম বিষয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রয়োজনে ঔপনিষদিক পরিবারের সদস্য ঋষি রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সমস্যা সমাধানে মঙ্গলময় বা আনন্দময় পরমপুরুষ ঈশ্বরের দারস্থ হয়েছেন। বলাই বাহুল্য অধ্যাত্মজাতীয় কবিতা রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার (১৯১৩) এনে দিয়েছিল। বলা যায়, তার সূচনা উনিশ শতকের 'নৈবেদ্য' (রচনাকাল ১৩০৪ ও ১৩০৭ বঙ্গাব্দ) কাব্যগ্রন্থে। প্রসঙ্গত উলেখ্য, পরবর্তীকালে রচিত ইংরেজী 'Song Offerings' কাব্যগ্রন্থটিতে 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতা স্থান পেয়েছে।

উনিশ শতকের গীতিকবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সাফল্যের শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছিলেন। তাঁর কবিতাগুলি কল্পনা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীতে সমৃদ্ধ। পাঠক রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতাতে দেশানুরাগের একটি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা এবং অন্তরছোঁয়া আবেদন অনুভব করে। উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃত কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২), 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬), 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনারতরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালি' (১৮৯৬), 'কথা' (১৯০০), 'কাহিনী' (১৯০০), 'ক্ষণিকা' (১৯০০), 'কল্পনা' (১৯০০), 'কণিকা' (১৯০০), 'নৈবেদ্য' (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)।

পরিবারের বাংলা ভাষা অনুরাগের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন;—

"বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিতসমাজ অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন; সদরে ব্যবহার হত ইংরেজি — চিঠিপত্রে, লেখাপড়ায়, এমন — কি, মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারে নি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।"(১০৮)

ঠাকুরবাড়ীর বাংলা ভাষাপ্রীতির পরিবেশে বালক রবীন্দ্রনাথ লালিতপালিত হয়েছিলেন। প্রথাগত বিদ্যাচর্চা তাঁর কাছে বিরক্তিকর বা অসহ্য হয়ে উঠলে, সেই অবসরে বাংলা কবিতা রচনার নেশা তাঁকে পেয়ে বসে। কবি বলেন;—

"পয়ার-ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকারবোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট অক্ষর দশ অক্ষরের চৌকো-চৌকো কত রকম শব্দভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ-ভাঙাগড়ার খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সামনে।" (১০৯)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ কবি জীবনে বিভিন্ন স্বাদের অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। প্রথম জীবনে রচিত অনেক লেখাকে তিনি নিজেই স্বীকৃতি দিতে চান নি। আবার স্বীকৃতি দিলেও বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন স্বীকৃতির পিছনে সাহিত্য গুণ নয়, অন্য কারণের কথা। তবে হিন্দুমেলার মতো স্বদেশীয় আবহাওয়ায় বেড়ে উঠায় বালক কবির কবিতায় সমকালের জাতীয় ভাবনার উত্তাপের ছবি পাওয়া যায়। কবি রচিত অনেক কবিতা রয়েছে — যা পরবর্তীকালে কোন গ্রন্থে স্থান পায় নি। কবিতাগুলি যে রবীন্দ্রনাথের তা সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রবীন্দ্রানুরাগী ও গবেষক প্রমাণ করেন। এই সময়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতা বা গভীর সাহিত্যগুণের সন্ধান বৃথা। তবে সাহিত্য সৃষ্টিতে যে অনাবিল আনন্দ আছে তা রবীন্দ্রনাথ এই বালক বয়সেই অনুভব করেন। এই প্রথম জীবনের রচনাগুলি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ ও সমৃদ্ধ সাহিত্যসম্ভারের অঙ্কুর হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রথম জীবনে বালক রবীন্দ্রনাথ মূলত বিহারীলাল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ কবির আদর্শে 'ভারতী','বালক', 'বান্ধব','জ্ঞানাঙ্কুর' 'প্রতিবিম্ব','তত্ত্ববোধিনী' ইত্যাদি পত্রিকায় লিখতেন।

এসব পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ কিছু কবিতার বিষয়বস্তু ছিল স্বদেশের দুরবস্থা বর্ণনা, দেশজননীর দুঃখমোচনে উৎসাহ দেওয়া বা সমজাতীয় ভাবনা। প্রসঙ্গত — 'হোক ভারতের জয়', 'হিন্দুমেলার উপহার', 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ দ্বিগুণ', 'দিল্লি দরবার' প্রভৃতি কবিতার কথা বলা যায়। 'দিল্লি দরবার' কবিতায়

রবীন্দ্রনাথ দেশের পরাধীনতায় লজ্জাবোধ করেন। কবির ভাষায়;—

"তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে ব্রিটিশের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি—কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?" (১১০)

অথচ এদেশের অনেকেই বৃটিশ-শৃঙ্খলের বন্ধনে উল্লসিত। কবি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন;—

"হা রে হতভাগ্য ভারতভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলংকার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ-রাজের বিজয়রবে?
ব্রিটিশ-বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে ক'জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।"(১১১)

—এখানে ঔপনিষদিক পরিবারের সদস্য বালক কবি রবীন্দ্রনাথ পরিবারের স্বদেশীয় আবহমণ্ডলে প্রভাবিত হয়ে দেশের পরাধীনতার গ্লানিমূলক কবিতা লিখেছেন । রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃত প্রাক্ 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'সন্ধ্যা সংগীত', 'প্রভাতসংগীত', 'ছবি ও গান' এবং 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২) কবির বাংলা কাব্যানুরাগের স্বীকৃত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কবি কাব্যগ্রন্থটিকে 'কচি আমের গুটির' সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর ভাষায়;— "কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল।" (১১২) এই বাংলা কাব্য প্রেমে কবির অকৃত্রিম আনন্দ লাভ বাংলা সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথকেই সুগম করেছে। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর মতো 'প্রভাতসংগীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান'(১৮৮৪) কাব্যগ্রন্থ দুটি বালক কবির বিশেষ মুহূর্তের ভাবের ফসল, যাকে কবি বাংলা কবিতায় ব্যক্ত করেন। অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ বলেন;—"প্রভাতসংগীত' এ-সমস্ত লেখার আর-কোনো মূল্য যদি থাকে, সে ষোলো-আনা সাহিত্যিক মূল্য নয়।" (১১৩) পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছিল—ঠাকুর পরিবারে ভাষা ও সাহিত্য অনুরাগ ছিল

প্রবল। এই অনুরাগের ফলে বালক কবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে অনায়াসে কাব্যচর্চা করেছিলেন। সে সময় অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক বৈষ্ণব পদাবলী প্রাকাশিত হয়েছিল। বালক রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর রসিক পাঠক ছিলেন। এই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি তাঁর কৌতূহল ছিল প্রবল। বিশেষত ব্রজবুলি ভাষার শব্দ-ঝংকার কবিকে আকৃষ্ট করেছিল। কবির বৈষ্ণবপদ ও ব্রজবুলি ভাষা প্রেম থেকে জন্ম নেয় 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪)।

'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)

রবীন্দ্রনাথ 'কবির মন্তব্য' নামক ভূমিকায় স্বীকার করেছেন যে,—কাব্যগ্রন্থটি নবযৌবনের সময়ে রচিত। তিনি বলেন— আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন উপলব্ধি করেছিলাম। মনের তখন উদ্বেল অবস্থা। এই অবস্থায় কবির মনে হয়েছে রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে জীবনকে সার্থক করতে। কবি মানুষের নিকট প্রার্থনা করেছেন;—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
— — —
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।"(১১৪)

—বৃহত্তর মানব সংসারে আনন্দদান করাকে যিনি জীবনের অন্যতম লক্ষ বলেছেন, সেই কবি জাতীয় জীবনের দৈন্যাবস্থায় মর্মপীড়িত হবেন এটাই স্বাভাবিক। 'বঙ্গভূমির প্রতি' ও 'বঙ্গবাসীর প্রতি' কবিতা দু'টিতে বঙ্গমাতার করুণ দিকটি ফুটেছে। বঙ্গমায়ের সেই করুণ অবস্থার পিছনে বাঙলী জাতিই দায়ী। কবি বঙ্গমায়ের উদ্দেশ্যে বলেন;—

"মনের বেদনা রাখো, মা, মনে,
নয়নবারি নিবারো নয়নে,
মুখ লুকাও, মা ধূলিশয়নে—
ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে।" (১১৫)

নব যুবক রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর দেশ সেবার অনীহায় হতাশ, তাঁর ভাষায়;—

"কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ—
কাতরে কাঁদিবে, মা'র পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।" (১১৬)

'মানসী' (১৮৯০)

মানসীতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবের বা কাব্যরসের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের নানান শিল্প-রূপ দেখা যায়। কবি বলেছেন—"আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এলো মনোরাজ্যে।"(১১৭) সাহিত্যরস সৃষ্টি করতে গিয়ে সুদূরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও কবি ভুলে যান নি সমকালের দেশকে, দেশের মানুষকে। 'মানসী' কাব্যে স্বদেশের কিছু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর জীবন যাত্রাকে ব্যঙ্গ করে একাধিক কবিতা রচিত হয়েছে। যথা;—'দেশের উন্নতি' ও 'বঙ্গবীর'।

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙালী বিশ্বের পটভূমিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সময় কিছু যশপ্রত্যাশী ও সুখবিলাসী মানুষের রূপ চিত্রিত হয়েছে 'দেশের উন্নতি' কবিতায়। এই সময় সচেতন বাঙালী উন্নতির লক্ষ্যে বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি আত্ম-উন্মোচনের প্রতিটি শাখায় বিরাজ করেছিল। কিন্তু কিছু ভণ্ড দেশপ্রেমিক গালভরা দেশপ্রেম কথা, দলাদলি, মিথ্যা অহংকার নিয়ে ব্যস্ত। কবি বলেন—এসব উন্নতির লক্ষণ নয়। দেশের প্রকৃত উন্নতি চাইলে প্রথমে সর্বসাধারণের উন্নতি প্রয়োজন। কবি তাঁর বক্তব্যকে কাব্য রূপ দিয়ে বলেন;—

"সবাই বড়ো হইলে তবে
স্বদেশ বড়ো হবে,
যে কাজে মোরা লাগাব হাত
সিদ্ধ হবে তবে।" (১১৮)

—দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন:—

"করিব কাজ নীরবে থেকে,
মরণ যবে লইবে ডেকে
জীবনরাশী যাইব রেখে
ভবের উপকূলে।" (১১৯)

—এই কাব্য গ্রন্থে স্বদেশ ভাবনামূলক আর একটি কবিতা হল 'বঙ্গবীর'। উনিশ শতকে অনেকে শুধু গ্রন্থগত বিদ্যায় শিক্ষিত ছিল। কবি বাঙালীর এই প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। 'নিমাই', 'নেপাল', 'ভুতো'র মতো বঙ্গবীরগণ দেশ-বিদেশের ইতিহাস ও সাহিত্য পাঠ করে গর্বিত। কিন্তু এদের মুখস্থ করা বিদ্যা জাতীয় জীবনে কোন কাজে আসবে না। কেননা এতে পাঠকের সচেতনতা আসে না। উনিশ শতকে শিক্ষার ব্যাপক

প্রসারে এজাতীয় কিছু শিক্ষিত ব্যক্তির সৃষ্টি হয়েছিল। কবি এদের বিদ্যা চর্চার আগ্রহে অভিভূত হয়ে ব্যঙ্গ করে 'বঙ্গবীর' বলে অভিহিত করেছেন।

'সোনারতরী' (১৮৯৪)

'সোনার তরী' রচনা কালে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও পল্লী জীবনের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। নিসর্গপ্রীতি, জীবনদেবতা তত্ত্ব, ভাব ও রসের গভীরতা প্রভৃতি কাব্যটিকে উৎকর্ষতা এনে দিয়েছে। এরকম একটি উৎকর্ষ কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নীতি-বিষয়ক কবিতার সন্ধান মেলে। 'আকাশের চাঁদ' কবিতা কাব্যগুণ ও নৈতিকতা পাঠকের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। অসম্ভব ও অবাস্তব বস্তুকে কামনার ফলে কিভাবে তিলে তিলে সর্বনাশ নেমে আসে তারই নীতি কথা 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটি। 'সোনার তরী' কাব্যের আরো কয়েকটি কবিতায় নীতি কথার আভাস পাওয়া যায়। উনিশ শতকে বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের দর্শন অনেক চিন্তানায়কের নিকট আদরণীয় ছিল না। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন;—

"লয়ে কুশাঙ্কুরবুদ্ধি শাণিতপ্রখরা
কর্মহীন রাত্রিদিন বসি গৃহকোণে
মিথ্যা ব'লে জানিয়াছ বিশ্ববসুন্ধরা
গ্রহতারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।" (১২০)

পৃথিবীর সবকিছুই মায়া—কবির নিকট এই দর্শন ভ্রান্ত বলে মনে হয়েছে। কবি উনিশ শতকে বাঙালী জীবনের উত্তরণের কথা ভেবে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ দর্শনের প্রতিবাদ করেছেন 'মায়াবাদ' নামক সনেটে। কবি সেজন্য 'খেলা' নামক সনেটে উৎসাহ দিয়ে বলেন;—

"হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দকল্লোলাকুল নিখিলের সনে।" (১২১)

কেননা, মানুষের মত বাঁচতে হলে কর্মময় পৃথিবীর খেলায় যোগ দিতে হবে। কবি লিখেছেন;—

"থেকো না অকালবৃদ্ধ বসিয়া একেলা—
কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা!" (১২২)

কবি বলেছেন এই আনন্দময় পৃথিবীর কর্মে যোগ দিলে যদি কোন ক্ষতি হয় তো হবে। সে ক্ষতি তিনি সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়;—

"চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটি প্রাণী-সাথে এক গতি মোর।" (১২৩)

'বন্ধন' সনেটে কবি পৃথিবীর সমস্ত বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়েছেন। কেননা, তিনি স্বার্থপরের মতো নিজের মুক্তি চান না। পৃথিবীর সব সুখ দুঃখ আনন্দের মাঝে কবি থাকতে চান। কবির প্রশ্ন;—

"বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে?" (১২৪)

এই 'ধরণী' দুঃখ মোচনে অক্ষম । সবাইকে আনন্দ দেওয়া তার সম্ভব নয়। 'অক্ষমা' কবিতায় কবি তবুও বলেন;—

"সব আশা মিটাইতে পারিস নে হায়—
তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক!" (১২৫)

'আত্মসমর্পণ' সনেটে কবি ঘোষণা করেন—

"জন্মেছি যে মর্ত-কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।" (১২৬)

রবীন্দ্রনাথ কর্মবিমুখ হয়ে থাকতে চান নি, তিনি চেয়েছেন;—

তোমার আনন্দগানে আমি দিব সুর
যাহা জানি দু একটি প্রীতিসুমধুর
অন্তরের ছন্দোগাথা; ...
...কুসুমে চন্দনে
তোমারে পূজিব আমি; পরাব সিন্দূর
তোমার সীমন্তে ভালে; বিচিত্র বন্ধনে
তোমারে বাঁধিব আমি, প্রমোদসিন্ধুর
তরঙ্গেতে দিব দোলা নব ছন্দে তানে।" (১২৭)

'সোনার তরী' কাব্যের শিল্প সমৃদ্ধ এই সনেটগুলি দেশের মানুষের স্তব্ধ জীবন থেকে মুক্তি এনে দিতে ও সচেতন করতে যথেষ্ট নীতিকথা-সম্পদে সমৃদ্ধ ।

'চিত্রা' (১৮৯৬)

চিত্রা কাব্যের সৌন্দর্য চেতনা, জীবনদেবতা তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় কাব্যটিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের মর্যাদা এনে দিয়েছে । রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার দ্বারা 'চিত্রা'কে উৎকর্ষতা এনে দিতে গিয়ে জগৎ ও জীবনের কথা বলতে ভোলেন নি। প্রতিভার এই উৎকর্ষ লগ্নে তিনি জীবনকে সমৃদ্ধ করার মন্ত্র শুনিয়েছেন। 'স্বর্গ হইতে

বিদায়' এ বিষয়ের একটি প্রতিনিধিমূলক কবিতা। যেখানে শুধুই সুখ, প্রেম নেই এরকম স্বর্গে কবি থাকতেচান নি। 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় সুখের ঐশ্বর্য ভরা জগৎ থেকে রবীন্দ্রনাথ ধূলিমাখা মর্তের সুখ-দুঃখ মিশ্রিত জগতে আসতে চেয়েছেন। কেননা মর্তে আছে প্রেম। কবির ভাষায়;—

"স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্তে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্তমিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।" (১২৮)

অর্থাৎ শুধুই সুখের ঐশ্বর্যে ভরা জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে সুখ দুঃখে ভরা জীবনকে কবি বরণ করতে চেয়েছেন। কবি একে 'মাতৃভূমি' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এই 'মাতৃভূমি'-কে স্বার্থপর শোষক শ্রেণী অন্যায় অত্যাচারের পীঠস্থান করে তুললে কবি বলেন;— 'এবার ফিরাও মোরে'। কবি ফিরতে চান সেখানে, যেখানে হচ্ছে অন্যায়, অত্যাচার। কারণ এই অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই কবিতাটিও একটি নীতিমূলক কবিতার উদাহরণ। কবি স্বার্থ সর্বস্বতাকে দূরে ফেলে দিয়ে বলেন;—

"কী গাহিবে, কী শুনাবে! বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।" (১২৯)

স্বার্থশূন্য পরহিতৈষী হয়ে বাঁচলে চরম শান্তি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ চারদিকে তাকিয়ে দেখেন— অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারে ছেয়ে গেছে সমগ্র সমাজ। কবি তাই সংসারের সীমায় ফিরতে চেয়েছেন;—

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী!" (১৩০)

কেননা এই বাস্তব সংসার অসহায়। এর থেকে মুক্তির উপায় একমাত্র কবি বলে দিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ আসন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাস রেখে বলেন;—

"এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা—এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে," (১৩১)

অর্থাৎ নিপীড়িত অসহায় মানুষের মুখে ভাষা দিতে হবে, বুকে দিতে হবে আশা, দিতে হবে সাহস এবং একতার মন্ত্র — তবেই মুক্তি সম্ভব। এতে আবহমান কালের উঁচু নীচু শ্রেণীর বৈষম্য থেকে মুক্তির একটি পথ নির্দেশ আছে, যা কবি প্রতিভার স্পর্শে পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে।

'চৈতালি' (১৮৯৬)

অপ্রত্যাশিত ক্ষণজন্মার মতো রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্যে 'চৈতালি'র জন্ম। এই সময় শিক্ষিত-সচেতন ব্যক্তি দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। শিক্ষিত মনের এই মানসিকতা 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থে লক্ষ করা যায়। শুধু তাই নয় বাঙালী জীবনের উন্নয়নে প্রতিকূল নানা বিষয়েরও সমালোচনা 'চৈতালি'তে পাওয়া যায়। 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থে স্বদেশ ভাবনা মূলক কবিতাগুলির দু'টি ভাগ যথা —

ক) সমসাময়িক বাঙালীর জীবনকেন্দ্রিক কবিতা।

খ) প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগমূলক কিছু কবিতা।

বাঙালীর জীবন কেন্দ্রিক কবিতা 'স্নেহগ্রাস' ও 'বঙ্গমাতা'। কবিতা দুটিতে দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। 'স্নেহগ্রাস' কবিতায় কবি বঙ্গমায়ের অত্যধিক স্নেহে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। কবি মনে করেন বঙ্গমাতা এভাবে স্নেহের ডোরে বাঁধলে বাঙালী কোনদিনই মাথা তুলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। অযথা স্নেহ দেখিয়ে বঙ্গমাতা তার সন্তানকে ঘরকূণো করে তুলছে। কবি বঙ্গ জননীকে শুনিয়ে বলেন;—

"নিজের সে, বিশ্বের সে,-বিশ্বদেবতার—

সন্তান নহে গো মাতঃ, সম্পত্তি তোমার।" (১৩২)

উনিশ শতকের বাঙালীর বিশ্বজয়ের পটভূমিতে কবির এরকম মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এবং 'বঙ্গ মাতা' কবিতায় কবি বলেন যার যেখানে স্থান তাকে তা গ্রহণ করতে দেওয়া হোক। নইলে বাঙালী কোন দিনও মানুষ হবে না। তাই বঙ্গমায়ের উদ্দেশ্যে কবি বলেন;—

"সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,

রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ কর নি।"(১৩৩)

—এছাড়া 'পরবেশ', 'দুই উপমা', 'অভিমান' প্রভৃতি কবিতা বাঙালীর পরনির্ভরতা, মানসিক জড়ত্ব প্রভৃতিকে ব্যঙ্গ করে রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রমথনাথ বিশী বলেন;—

"একদিকে এই সাতকোটিবাঙালী কেমন ভাবে আপন জড়ত্বে ও তন্ত্রমন্ত্রসংহিতায় আবদ্ধ, অন্যদিকে বৃথা আস্ফালনে ও পরবেশে নিজের সেই অভ্যন্তরিক দৈন্য কি রকম করিয়া ঢাকিতে চাহিতেছে—এই বিষয়ে কবি তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়াছেন।" (১৩৪)

রবীন্দ্রনাথ সমকালীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির চেয়ে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অনেক ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট মনে করতেন। তাঁর 'সভ্যতার প্রতি', 'প্রাচীন ভারত', 'তপোবন', 'বন' প্রভৃতি কবিতায় এরকম মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। 'সভ্যতার প্রতি' কবিতায় সমকালীন নগর সভ্যতায় বিরক্ত কবি বলেন;—

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি," (১৩৫)

কবি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শান্ত ও সৌম্য পরিবেশে মুগ্ধ। সেজন্য তিনি প্রাচীন সভ্যতার গুণকীর্তন করেছেন। কবি বলেন আমাদের প্রাচীন ভারতের—তপোবন, গোচারণ, সন্ধ্যাস্নান, গ্লানিহীন দিন, সামগান, বল্কল বসন, সুগভীর মহাতত্ত্ব আলোচনা ফিরিয়ে দাও। কবি রবীন্দ্রনাথ এই আবেদনের দ্বারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম দরদ প্রকাশ করেছেন।

'কণিকা' (১৩০৬/8ঠা অগ্রহায়ণ)

'কণিকা'য় জীবনের কিছু ধ্রুব সত্যকে কবি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেন। আমাদের মনে হয়—রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার স্পর্শে কিছু ধ্রুব সত্যকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। যা পাঠকের নীতি বোধ ও চেতনার উদ্বোধন ঘটাতে সাহায্য করবে। যেমন—'স্বদেশদ্বেষী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন;—

"কেঁচো কয়, নীচ মাটি, কালো তার রূপ।
কবি তারে রাগ ক'রে বলে, চুপ চুপ!
তুমি যে মাটির কীট, খাও তারি রস,
মাটির নিন্দায় বাড়ে তোমারি কি যশ!" (১৩৬)

যারা স্বদেশকে পদে পদে নিন্দা বা অবজ্ঞা করে, তাদের সেই মানসিকতাকে আঘাত করতে ও নীতিবোধ জাগিয়ে তুলতে 'স্বদেশদ্বেষী' কবিতার বক্তব্য যথেষ্ট।

'কথা ও কাহিনী' (১৯০০)

'কথা ও কাহিনী' উনিশ শতকের শেষ দশকে রচিত হয়। প্রথমে 'কথা' ও 'কাহিনী' দু'টি ভিন্ন গ্রন্থ ছিল। রবীন্দ্ররচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশে বলা হয়েছে;—'ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে স্বতন্ত্রভাবে 'কথা ও কাহিনী' নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়।" (১৩৭) 'কথা' উপহার দেওয়া হয়েছে দেশমাতৃকার যোগ্যতম সন্তান বিজ্ঞানের সাধক জগদীশচন্দ্র বসুকে। জগদীশচন্দ্র বসু যেন প্রাচীন ভারতের ঋষির মত। তিনি মাতৃভূমিকে অতুল সম্মান এনে দিয়েছেন। কবি 'উৎসর্গ' পত্রে দু'লাইনে বলেন;—

"সত্য রত্ন তুমি দিলে, পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।" (১৩৮)

'উৎসর্গ' পত্রের ভাববস্তু থেকে অনুমান করা যায় কাব্যগ্রন্থটি স্বদেশ ভাবনায় সমৃদ্ধ। 'কথা' কাব্যের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—কাব্যের উপাদান ভারতীয়, এখানে স্থান পেয়েছে বৌদ্ধকথা, রাজপুত কাহিনী, শিখ জাতির কাহিনী, বৈষ্ণব গল্প। তিনি অবশ্য স্বীকার করেন মূলের সঙ্গে কিছুটা ব্যতিক্রমও আছে।

'কথা' কাব্যগ্রন্থের প্রথমে কবি অতীতকে কথা বলার জন্য আবেদন জানান। কবি আত্মবিস্মৃত জাতিকে গৌরবময় স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য অতীতকে বলেন;—

"যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও।" (১৩৯)

'কথা' কাব্যের ভূমিকামূলক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সুগভীর আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। কবি এখানে স্বদেশের অতীত গৌরব তথা ঐতিহ্যকে প্রকাশ করার জন্য আন্তরিক প্রয়াস করেন। 'কথা' কাব্যের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'পূজারিণী' 'সামান্য ক্ষতি', 'গুরুগোবিন্দ', 'শেষ শিক্ষা', 'বিবাহ' প্রভৃতি প্রতিটি কবিতাতেই স্বদেশের গৌরব বৌদ্ধ-কথা, শিখ-কথা, বৈষ্ণব-কথায় পরিপূর্ণ।

'কাহিনী' কাব্যের ভূমিকা মূলক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'স্মৃতি অবগাহিনী' এর স্মরণাপন্ন হয়েছেন।

ছোটখাটো নানা ঘটনার কাহিনী রচনা করে 'স্মৃতি অবগাহিনী'। 'কাহিনী' কাব্যের অন্তর্ভূক্ত 'দীনদান', 'বিসর্জন', 'দুই বিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য' প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নানান ছোটখাটো অথচ মহৎ ত্যাগ, শৌর্য, বীর্য প্রভৃতি ঘটনাকে নিয়ে কাহিনী রচনা করেন।

'কল্পনা' (১৩০৭ বঙ্গাব্দ)

উনিশ শতকের একেবারে শেষে 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। শিক্ষিত বাঙালীর মনে তখন আত্মচেতনাবোধ জেগেছে। কবিমন এই আত্মচেতনা বোধ থেকে দূরে ছিল না, তার প্রমাণ এই কাব্য গ্রন্থের 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ', 'সে আমার জননী রে', 'উন্নতির লক্ষণ', 'জগদীশচন্দ্র বসু' প্রভৃতি কবিতা। উল্লিখিত কবিতা গুলিতে বঙ্গজননীর দুর্দশার ছবি ও বাঙালীর অকর্মণ্যতা, পরানুকরণপ্রিয়তা প্রভৃতি বর্ণনা পাঠককে সচেতন করার পক্ষে যথেষ্ট। যেমন 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতায় বঙ্গজননীর দুর্দশা, বাঙালীর অকর্মণ্যতা প্রভৃতি সুন্দরভাবে ফুটেছে। কবি লিখেছেন;—

"রয়েছ, মা, ভুলি
তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাটশোভা সীমন্তরতন,
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে।" (১৪০)

বাঙালীর দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতার ফলে জাতীয় স্বাধীনতা বিপর্যস্ত। এই পরাধীনতার গ্লানি পাঠককে গভীরভাবে ব্যথিত করে তোলে। পাশাপাশি শুধু সমালোচনাই নয়, বঙ্গ সন্তানের বৃহৎ সাফল্যে কবি গৌরববোধ করেন। যেমন 'জগদীশচন্দ্র বসু' কবিতায় কবি বলেন—বঙ্গ সন্তান জগদীশচন্দ্র বসু গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের নিকট স্বীকৃতি পেয়েছেন। এই স্বীকৃতি লাভের আনন্দে কবি আনন্দিত। কেননা আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে বিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কারের দ্বারা জগদীশচন্দ্র বসু বিশ্বজননীর নিকট বঙ্গজননীকে সম্মানিত করেছেন।

'ক্ষণিকা' (১৯০০)

'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থে জানা যায় কবি গান গাইতে চেয়েছেন। 'উদ্‌বোধন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন;—

" যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে —
তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।" (১৪১)

প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দনের বন্দনা গান গাইতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ নৈতিকতা, প্রাচীন গৌরব কথা ভুলে যান নি। 'বোঝাপড়া' কবিতায় কবি উপদেশ দিয়েছেন—জীবনের নানারকম পরিস্থিতিতে সত্যকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে হবে। কবির ভাষায়;—

"মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যের লও সহজে।"(১৪২)

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' কবিতায় বাঙালীর ঘরকূনো মানসিকতার বিপরীত ভাববস্তু প্রকাশ পেয়েছে। কবি যেন বোঝাতে চেয়েছেন—ঘর না ছাড়লে জীবন সমৃদ্ধ হবে না। তাই কবি বাণিজ্য করতে বাইরে যেতে চেয়েছেন। কবির ভাষায়;—

"কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার
কহো আমায় ধনী,
তাহা হলে সেই বাণিজ্যের
করব মহাজনি।
দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে
ছায়ার মতো চরণদেশে
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে
আর বসে না রইব—
এটা আমি স্থির বুঝেছি
ভিক্ষা নৈব নৈব।" (১৪৩)

'শেষ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জগৎ ও জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি প্রকাশ করেন। এযেন আমাদের স্বদেশের দার্শনিক ভাবনা 'জগৎ মায়াময়'-এর এর প্রতিবাদমূলক কবিতা। জগৎটাকে মিথ্যা বা মায়া ভেবে বসে থাকলে অধঃপতন অনিবার্য। কবি এই সত্যকে আবিষ্কার করে বলেন;—

"জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিয়ে
যায় যদি যাক খুলি,
মর্তে যেন না ভেঙ্গে যায়
মিথ্যা মায়াগুলি।"(১৪৪)

আলোচিত 'বোঝাপড়া', 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ', 'শেষ' কবিতা তিনটিতে কবির ভাবনা বাঙালীর জীবনকে সমৃদ্ধ করতে রচিত হয়েছে—এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়। আবার এই কাব্য গ্রন্থেরই 'সেকাল' কবিতায় প্রাচীন ভারতের শান্তিময় পরিবেশের কথা প্রকাশ পেয়েছে। যার আবেদন পাঠককে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে। এ রকমই আর একটি কবিতা 'জন্মান্তর'। কবি এখানে ভারতে শান্ত-স্নিগ্ধ-মোহমাখা জীবনকথাকে কাব্যরূপ দেন। রবীন্দ্রনাথ সমকালের সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন;—

"আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাই না হতে নববঙ্গে
নব যুগের চালক।
আমি নাই বা গেলেম বিলাত,
নাই বা পেলেম রাজার খিলাত;
যদি পরজন্মে পাই রে হতে
ব্রজের রাখাল বালক
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক।" (১৪৫)

—এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার সুখভোগের চেয়ে প্রাচীন ভারতের স্নিগ্ধ, শান্ত, সৌম্য ও সমৃদ্ধ সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছে। যা পাঠককে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী করতে সাহায্য করে ।

'নৈবেদ্য' (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)

রবীন্দ্রনাথ যে অধ্যাত্মবাদের জন্য ভুবনবিখ্যাত তার সূচনা এই 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে। কাব্যগ্রন্থখানি তিনি উৎসর্গ করেন পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। যিনি উনিশ শতকের অধ্যাত্মবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবাদ পুরুষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত যে রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' ১৩০৮ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেলেও কবিতাগুলি ১৩০৪ ও ১৩০৭ বঙ্গাব্দে রচিত হয়। সেজন্য 'নৈবেদ্য'কে উনিশ শতকের কাব্যগ্রন্থ হিসাবে মনে করলে খুব একটা ভুল হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৈবেদ্য' কাব্যের কবিতাগুলি সবই প্রার্থনা মূলক। জগৎকর্তা-পরমপুরুষ-আনন্দময় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কবি অন্তরের গাঢ় ভক্তি মিশ্রিত প্রার্থনা 'নৈবেদ্য'। আশ্চর্যের বিষয় সেই আনন্দময় পরম পুরুষের নিকট রবীন্দ্রনাথ স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। '৪৮' নং কবিতায় কবি প্রার্থনা করেছেন;—

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।" (১৪৬)

—কবি নির্ভীক ও সাহসী জাতির কামনা করেন, যারা কাপুরুষতা ও ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে মাথা তুলে দাঁড়াবে। '৭২' নং কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জাতিকে সমৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথ বলে দিয়েছেন। কবি জানেন নির্ভীকতা, মুক্তজ্ঞান, উদারমনস্কতা, অকৃত্রিম মনোভাব, নিরপেক্ষতার মতো কিছু শর্ত পালন করলে বাঙালী জীবন সমৃদ্ধ হবে। তাই তিনি দয়াময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন উল্লিখিত ইতিবাচক গুণাবলী বাঙালীর জীবনে এনে দিতে। তাহলে বাঙালী সমৃদ্ধ ও শান্তির সন্ধান পাবে। কবি বলেন;—

"ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।" (১৪৭)

সমজাতীয় ভাবনা 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের '৯৩' নং '৯৪' নং ও '৯৫' নং কবিতায়ও পাওয়া যায়।

'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থটি আর একটি কারণে স্মরণীয়। তা হল এখানেই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মিকতার পূর্ণাঙ্গ সুর প্রথম উচ্চারিত হয়। এই অধ্যাত্মিক সম্পদে ভারত সমৃদ্ধ যা কবি কাব্যাকারে বিশ্বপাঠকের নিকট আস্বাদনীয় করে তুলেছেন। ফল স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এ রকম একটি খাঁটি ভারতীয় মহৎ ভাবনা কবি মনে উনিশ শতকের শেষে জেগে উঠেছে। অতএব ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'Song Offerings' এর দ্বারা অনেক পরে সাহিত্য ক্ষেত্রে বাঙালীর বিশ্ব জয় হলেও উনিশ শতকের শেষে

এই একই ভাবনায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। যা বিশ্ব পাঠকের নিকট অভিনব, বিস্ময়কর ও আশ্চর্য বলে মনে হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'Song Offerings' ইংরেজী কাব্য গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে 'নৈবেদ্য' কাব্যের একাধিক কবিতা ।

রবীন্দ্রনাথ কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধের দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিলেন। এখানে শুধুমাত্র উনিশ শতকের গীতিকবিতায় কবির স্বদেশ, স্বজাতি সর্বোপরি মানব কল্যাণের বিষয়টি আলোচিত হল। আমরা তাঁর উনিশ শতকের গীতিকবিতার আবেদন উপলব্ধি করে বলতে পারি, কবি উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা সৃষ্টিতে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

এবার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উনিশ শতকের গীতিকবিতায় স্বদেশ ভাবনার আলোচনা করা হবে। বাংলা সাহিত্যের স্বনাম ধন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। ডঃ সুকুমার সেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে লিখেছেন;—

> "সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞানী বুদ্ধির অংশ প্রবল ছিল।...মানব-সংসারের জ্ঞানভাণ্ডারের প্রায় সকল সামগ্রীর প্রতিই তাঁহার যে সজাগ কৌতূহল ছিল, তাহার পরিচয় তাঁহার কাব্যে প্রায় সর্বদা লভ্য, তা সে প্রাচীন ইতিহাস হোক আর আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানই হোক। কবিতারচনার জন্য জ্ঞানের সঞ্চয় প্রচেষ্টা আধুনিককালে আমাদের দেশে সত্যেন্দ্রনাথের রচনাতেই প্রথম প্রকটিত।
>
> সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানসের বহিঃপ্রকাশ স্বদেশপ্রীতিতে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রিয়তায়।" (১৪৮)

অর্থাৎ সুকুমার সেন মনে করেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কাব্য সাহিত্যে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রিয়তা' ও স্বদেশ প্রেমের প্রচারে বিশেষ অবদান রেখেছেন। আমরা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে স্বদেশ ভাবনার বিষয়টি আলোচনা করব। প্রসঙ্গত স্মরণীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মূলত বিশ শতকে কাব্য চর্চা করলেও উনিশ শতকেও কিছু কবিতা লিখেছেন। আমরা কবির উনিশ শতকীয় গীতিকাব্যে স্বদেশ ভাবনার বিষয়টি স্পষ্ট করব। এই শতকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রকাশিত একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' (১৯০০)। অবশ্য এই শতকেই তিনি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'র (রচনা- ১৩০০ বঙ্গাব্দ) মতো একাধিক কবিতা লিখেছেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গভূমিকে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলেন। তাঁর ভাষায়;—

> "স্বর্গ হতে গরীয়সী জন্মভূমি মোর," (১৪৯)

— কিন্তু প্রিয় বঙ্গভূমির সমকালীন দুরবস্থা দেখে আহত কবি জন্মভূমিকে প্রশ্ন করেন;—

"এ স্বর্গে দেবতা কই? দেখায়ে দে ত্বরা।
বল্ মোরে, কোন্ হেতু, সুপ্ত আজি তারা?
অথবা, মগন কোনো তপস্যায় ঘোর ?
কবে ধ্যান ভাঙিবে গো,— নিশি হবে ভোর?
কবে,মা, ঘুচিবে তোর নয়নের ধারা?

অসুরে ঘিরেছে, হায়, কল্প তরুবরে,
দেবতার কামধেনু দানবে দুহিছে!
আজি হতে অন্বেষি' ফিরিব ঘরে, ঘরে,
কোথা ইন্দ্র?— ব'লে দেগো, কাঁদিসনে মিছে।" (১৫০)

—'স্বর্গাদপি গরীয়সী' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেন বঙ্গভূমির পরাধীনতার কথা গভীর দুঃখের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন।

'সবিতা' (১৯০০) কাব্যেও সুগভীর দেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। 'সবিতা'র 'সূচনা'য় সত্যেন্দ্রনাথ সমকালের দেশের অধঃপতনে গভীর বেদনা প্রকাশ করেছেন। দেশের অধঃদশা থেকে উত্তরণের জন্য কবি সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন;—

> "প্রাচ্যের বৈদিক ঋষি এবং প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক উভয়ের চক্ষেই সবিতা জ্ঞানের আধার—প্রাণের আধার।... তাই আমাদের প্রাণহীন জাতিকে অতীত ও বর্তমান স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত আজি ঐ প্রাণময় অমিততেজা বিশ্বজ্ঞানরূপী সবিতার মূর্তি অঙ্কিত করিবার প্রয়াস। জীবনে উৎসাহ চাই, মনে তেজ চাই, কর্মে আনন্দ চাই, হৃদয়ে স্ফূর্তি চাই। দর্শনের অবসাদ ঔদাস্য যথেষ্ট হইয়াছে।...সত্য বটে দর্শনই বিজ্ঞানের ভিত্তি, তাহা হইলেও অভিব্যক্তি হিসাবে বিজ্ঞান দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।...এখনও সময় আছে। পূর্ব প্রতিভার অঙ্গারে এখনও অনল আছে। কে বলিল উৎসুক ফুৎকারে জ্বলিয়া উঠিবে না? ভারত দর্শনের শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞানে না হইবে কেন" (১৫১)

আসলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জানতেন জাতির দুরবস্থা মোচনের জন্য চাই পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান শিক্ষা। বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে দূরে থাকলে বাংলা তথা ভারতের মুক্তি আসবে না। 'সবিতা' কাব্যে জ্ঞানের প্রার্থনা লক্ষ করা

যায়। যে প্রার্থনা জাতিকে সমৃদ্ধ করার পক্ষেই রায় দেবে। কবি 'সবিতা'কে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে কল্পনা করেন। সেই 'সবিতা'র বন্দনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন;—

"তিমির রূপিণী নিশা,—হে বিশ্ব-সবিতা!
তুমি দেব, নির্মল-কিরণ!
আলোকের আলিঙ্গনে রমিত তিমির,
ফুল্ল উষা—অপূর্ব মিলন।
পুষ্পময়ী বসুন্ধরা,
দ্যুলোক আলোক ভরা,
জনয়িতা—সবিতা—সবার!
বরণীয়—রমণীয়—নিত্য— জ্ঞানাধার !" (১৫২)

—এই জ্ঞানের অনুশীলন বা চর্চা করে প্রাচীন যুগেই ভারতবর্ষ সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। কবির ভাষায়;—

"চেতনা জাগিল জড়ে,—তরু, পশু, নর,
আর্য জাতি বিকাশ চরম!
উজলিল সিন্ধু-গিরি, কক্ষ-গিরি শির,
আর্যদেরি প্রতিভা পরম।
সে আলোকে আত্মহারা—
ভাসিল পুলকে ধরা,
বিশ্ববাসী লভিল পরান,—
ভারত তুলিল যবে জ্ঞানের নিশান!" (১৫৩)

—কিন্তু সমকালের ভারতে অবস্থা খুবই করুণ। কবি বলেন ;—

"ভারত,— ভারত-মাতা, জননী আমার,
আজি কেন তোমার সন্তান—
অলস, অবশ হেন—প্রাণহীনসম?
হারায়েছে সে পূর্ব সম্মান।
কোথা সে উৎসাহ, বল,—
লঙ্ঘিল যে বিন্ধ্যাচল,
কোথা আজি—কোথা আজি, হায়,
সে প্রতিভা, জ্ঞান-প্রভা, বিশ্ব মুগ্ধ যা'য়।" (১৫৪)

কিংবা এককালে অতীত ঐতিহ্য থাকার পরেও সমকালের দুরবস্থায় কবি মর্মপীড়িত হয়েছেন।—

"তাদেরি সন্তান সব, তবে কেন হায়,
সেই তেজ, সে উৎসাহ নাই?
তারা যেন জ্ঞান-যজ্ঞে দীপ্ত হুতাশন,—
অবশেষে মোরা শুধু ছাই।" (১৫৫)

কবি বিজ্ঞানের জয়গান গেয়েছেন। তিনি বিজ্ঞানের বৃহৎ শক্তিতেও মুগ্ধ। তাঁর ভাষায়;—

বিজ্ঞান! বিজ্ঞান! আজি তোমার মহিমা—
কলগীতি তুলেছে জগতে," (১৫৬)

সবিতার শেষে সেজন্য কবি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে 'সবিতা'কে বলেন;—

"হে, সবিতা জ্ঞানের কিরণ,—
আরো আলো—আরো আলো কর বিতরণ!" (১৫৭)

এই অধ্যায়ে আমরা লক্ষ করেছি, উনিশ শতকে ক্রমশ আত্মচেতনার যুগে বাঙালী গীতিকবি যথাক্রমে ঈশ্বরগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ স্তব্ধ জাতীয় জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দন দানের জন্য উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন। অতএব বলা যায়, উনিশ শতকের স্বদেশ ভাবনা নামক অনুভূতিটি বাংলা গীতিকাব্যকে প্রভাবিত করেছিল।

উল্লেখপঞ্জী

১। এবার ফিরাও মোরে, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ:১৪২।

২। গীতিকাব্য, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড,সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ১৬৫।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড— ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৮৭।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২।

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ২১৭।

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৪০, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৭৫, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৩৯৮, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ফাল্গুন ১৪০৭, ষষ্ঠ মুদ্রণ ঃ আষাঢ় ১৪১০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৫১৮।

৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৫৮।

৮। এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির প্রতি বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন, ঈশ্বর গুপ্ত রচনাবলী, (১ম খণ্ড)—সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, দত্ত, চৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা, পৃ: ১।

৯। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী, নতুন সংস্করণ ঃ ১৯৯৫, পৃ: ২৯৬।

১০। যুদ্ধের জয়, শীক সংগ্রাম, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ১৬৯।

১১। দ্বিতীয় যুদ্ধ, যুদ্ধের জয়, শিক সংগ্রাম, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ১৬৯।

১২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড— ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ২৩২-২৩৩।

১৩। আচারভ্রংশ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃঃ ৯৯।

১৪। ইংরেজী নববর্ষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃঃ ৫৪।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩।

১৬। বড়দিন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃঃ ৭৩।

১৭। দুর্ভিক্ষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃঃ ৯৬।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।

২০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।

২১। নীলকর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, ততীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃঃ ৭৪।

২২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২।

২৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩।

২৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯।

২৫। সব হ্যায় ফাক্, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃঃ ১।

২৬। ভরপূর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ২।

২৭। কিছু কিছু নয়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ৪-৫।

২৮। সাম্য, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ১৬।

২৯। শরীর অনিত্য, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ২০।

৩০। প্রাগুক্ত, পৃ: ২১।

৩১। স্বদেশ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ২১৩।

৩২। প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৩।

৩৩। মাতৃভাষা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ২১২।

৩৪। বাংলা দেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (আধুনিকযুগ), শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৮৮, (আগষ্ট, ১৯৮১) বাণী মুদ্রণ, পৃ: ৫৩৩।

৩৫। কালচক্র, কবিতাবলী, ১ম খণ্ড, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, কবিতাবলী-১ম খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ১০৮-১০৯।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৯-১১০।

৩৭। ভারত বিলাপ, কবিতাবলী, ১ম খণ্ড, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, কবিতাবলী-১ম খণ্ড, সম্পাদক - শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ২৪-২৫।

৩৮। ভারত সঙ্গীত, কবিতাবলী, প্রথম খণ্ড, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, কবিতাবলী-১ম খণ্ড, সম্পাদক— শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ১১৬।

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৯-১২০।

৪০। মন্ত্র সাধন, বিবিধ, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৬০, পৃ: ১৩৪।

৪১। জয় মঙ্গল গীত, বিবিধ, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৬০, পৃ: ১৩৮-১৩৯।

৪২। ভারতকামিনী, কবিতাবলী, প্রথম খণ্ড, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, কবিতাবলী ১ম খণ্ড, সম্পাদক— শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ৪৭।

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০-৫১

৪৪। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে, বিবিধ, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক— শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৬০, পৃ: ১৪০।

৪৫। রীপণ-উৎসব - ভারতের নিদ্রাভঙ্গ, বিবিধ, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৬০, পৃ: ৭১।

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১।

৪৭। রাখিবন্ধন, বিবিধ, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৬০, পৃ: ১৬৫।

৪৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৮।

৪৯। জন্মভূমি, চিত্তবিকাশ, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৬০, পৃ: ২৯-৩০।

৫০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২-৩৩।

৫১। আমার জীবন, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৩২৫-৩২৬।

৫২। চট্টোগ্রামের সৌভাগ্য উৎসব, অবকাশ রঞ্জিনী-১ম ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৬৪।

৫৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪।

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪।

৫৫। সায়ংচিন্তা, অবকাশ রঞ্জিনী-১ম ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৯৭।

৫৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৪।

৫৭। মুমূর্ষু শয্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক, অবকাশ রঞ্জিনী-প্রথম ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১০৭।

৫৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৯-১১০।

৫৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৮।

৬০। মহরাণীর দ্বিতীয়পুত্র ডিউকঅফ্ এডিন্‌বরার প্রতি, অবকাশ রঞ্জিনী-১ম ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী. ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১২৬।

৬১। অবলাবান্ধব, অবকাশ রঞ্জিনী-১ম ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১১৭।

৬২। আর্য্যদর্শন, অবকাশ রঞ্জিনী-২য় ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১৭৭।

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৮।

৬৪। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অবকাশ রঞ্জিনী-২য় ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১৮৪।

৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৫।

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৭।

৬৭। বাঙ্গালীর বিষপান, অবকাশ রঞ্জিনী-২য় ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১৯৩।

৬৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৩।

৬৯। অনন্ত দুঃখ, অবকাশ রঞ্জিনী-২য় ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১৯৬।

৭০। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০১।

৭১। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০১।

৭২। চিহ্নিত সুহৃদ্, অবকাশ রঞ্জিনী-২য় ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ২০৬।

৭৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৭।

৭৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৭।

৭৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৭।

৭৬। ভারত উচ্ছ্বাস, অবকাশ রঞ্জিনী-২য় ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৩৩৯।

৭৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪০।

৭৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪২।

৭৯। বঙ্গভাষা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৫৯।

৮০। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয়ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ২৯৪।

৮১। বঙ্গভাষা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৫৯।

৮২। কবি-মাতৃভাষা, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৯৪।

৮৩। সমাপ্তে, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৮৩।

৮৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৩।

৮৫। ভারত-ভূমি, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৮০।

৮৬। বঙ্গভূমির প্রতি, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৮৬।

৮৭। আত্মবিলাপ, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৮৬।

৮৮। কৃত্তিবাস, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪,সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৬০।

৮৯। কাশীরাম দাস, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৬০।

৯০। কমলে কামিনী, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৫৯।

৯১। অন্নপূর্ণার ঝাঁপি,চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৬০।

৯২। কালে কামিনী, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৬০।

৯৩। বাল্মীকি, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৮১।

৯৪। কালিদাস, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৬১।

৯৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬১।

৯৬। সংস্কৃত, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৭৯।

৯৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৭৯।

৯৮। কপোতাক্ষ নদ, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক — ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৬৬।

৯৯। বটবৃক্ষ, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক— ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৬৫।

১০০। বিহারীলাল, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ পৌষ ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৫৩৯,

১০১। কবির একখানি পত্র, সারদামঙ্গল, বিহারীলাল কাব্য সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৩৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৪২, পৃ: ২০৩।

১০২। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৩।

১০৩। বিহারীলাল, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ পৌষ ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৫৩৯।

১০৪। স্বপ্নদর্শন, বিহারীলাল কাব্য সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৩৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৪২, পৃ: ৬১২।

১০৫। নিশীথসঙ্গীত, শরৎকাল, বিহারীলাল কাব্য সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৩৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৪২, পৃ: ২৯১।

১০৬। চিন্তা, নিসর্গসন্দর্শন, বিহারীলাল কাব্য সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৩৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৪২, পৃ: ৪৫০।

১০৭। সমুদ্রদর্শন, নিসর্গসন্দর্শন, বিহারীলাল কাব্য সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৩৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৪২, পৃ: ৪৫৮।

১০৮। অবতরণিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৫।

১০৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬।

১১০। রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৫।

১১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫।

১১২। সূচনা, সন্ধ্যাসংগীত, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৫।

১১৩। সূচনা, প্রভাত সংগীত, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৪৫।

১১৪। প্রাণ, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৬১।

১১৫। বঙ্গভূমির প্রতি, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২১৮।

১১৬। বঙ্গবাসীর প্রতি, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২১৮।

১১৭। সূচনা, মানসী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৭।

১১৮। দেশের উন্নতি, মানসী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৯৫।

১১৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৫।

১২০। মায়াবাদ, সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১০৬-১০৭।

১২১। খেলা, সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১০৭।

১২২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৭।

১২৩। গতি, সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১০৮।

১২৪। মুক্তি, সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১০৮।

১২৫। অক্ষমা, সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১০৯।

১২৬। আত্মসমর্পণ, সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১১০।

১২৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৯।

১২৮। সর্গ হইতে বিদায়, চিত্রা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৮১।

১২৯। এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৪৩।

১৩০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪২।

১৩১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪২।

১৩২। স্নেহগ্রাস, চৈতালি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ চৈত্র ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৮।

১৩৩। বঙ্গমাতা, চৈতালি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ চৈত্র ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৮।

১৩৪। রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, অখণ্ড সংস্করণ, দশম মুদ্রণ ঃ শ্রাবণ ১৪০৭, পৃ: ৯৮।

১৩৫। সভ্যতার প্রতি, চৈতালি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ চৈত্র ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৮।

১৩৬। স্বদেসদ্বেষী, কণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ চৈত্র ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৬০।

১৩৭। গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৭৩১।

১৩৮। উৎসর্গ, কথা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১১।

১৩৯। কথা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৬।

১৪০। বঙ্গলক্ষ্মী, কল্পনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১২১।

১৪১। উদ্‌বোধন, ক্ষণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৭১।

১৪২। বোঝাপড়া, ক্ষরিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৮৩।

১৪৩। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ, ক্ষণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২০৯।

১৪৪। শেষ, ক্ষণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৫০।

১৪৫। জন্মান্তর, ক্ষণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২০৪।

১৪৬। ৪৮, নৈবেদ্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৮৯।

১৪৭। ৭২, নৈবেদ্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩০০।

১৪৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৫ম খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫৮, ৪র্থ সংস্করণ ঃ ১৯৭৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ মে ২০০২, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ আগস্ট ২০০৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৯৩।

১৪৯। বেনু ও বীণা, কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিঃ, ৩৩, কলেজ রোড, কলি, ১ম প্রাঃ, ভাদ্র, ১৩৭৮, সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃ: ৫৬।

১৫০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭।

১৫১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৫ম খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫৮, ৪র্থ সংস্করণ ঃ ১৯৭৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ মে ২০০২, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ আগস্ট ২০০৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৯৩।

১৫২। সবিতা, কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিঃ, ৩৩, কলেজ রোড, কলি, ১ম প্রঃ, ভাদ্র, ১৩৭৮, সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃ: ৯৯

১৫৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৪।

১৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫।

১৫৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৬।

১৫৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১০।

১৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৪।